একক ১ ❐ গণপরিষদ ও ভারতের সংবিধান রচনা

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ প্রস্তাবনা

১.৩ গণপরিষদ সৃষ্টির ইতিহাস

১.৩.১ গণপরিষদের প্রয়োজন বা গুরুত্ব

১.৩.২ ভারতীয় ভাবনা ঃ ১৯০৬ সালের জাতীয় কংগ্রেসের প্রস্তাব

১.৩.৩ হোমরুল আন্দোলন

১.৩.৪ অসহযোগ আন্দোলন ও গান্ধীজির স্বরাজ ভাবনা

১.৩.৫ সর্বদলীয় বৈঠক ও সংবিধান কমিটি

১.৩.৬ জাতীয় কংগ্রেসের বিভিন্ন সম্মেলনে গণপরিষদের দাবি

১.৪ গণপরিষদ সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব ও নীতি

১.৪.১ ১৯০৯ সালের বারত-শাসন আইন

১.৪.২ ১৯১৯ সালের ভারত-শাসন অঅইন

১.৪.৩ সাইমন কমিশন

১.৪.৪ গোল-টেবিল বৈঠক

১.৪.৫ সাংবিধানিক সংস্কার বিষয়ে শ্বেতপত্র

১.৪.৬ যৌথ সংসদীয় কমিটি ও ১৯৩৫ সালের বারত-শাসন আইন

১.৪.৭ ক্রিপস্ মিশন

১.৪.৮ ওয়াভেল পরিকল্পনা

১.৪.৯ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা

১.৪.১০ গণপরিষদের নির্বাচন

১.৪.১১ দেশবিভাগ, মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ও গণপরিষদ

১.৪.১২ ভারতীয় স্বাধীনতা আইন ও গণপরিষদ

১.৫ গণপরিষদ সম্পর্কে মুসলিম লিগের দৃষ্টিভঙ্গি

১.৬ গরপরিষদে দেশীয় রাজ্যের অশগ্রহণের প্রশ্ন

১.৭ গণপরিষদের গঠনপ্রণালী

১.৭.১ গণপরিষদে প্রতিধিত্ব, আসন বণ্টনের নীতি ও গণপরিষদের সদস্য সংখ্যা

১.৭.২ গণপরিষদের নেতৃত্ব

১.৭.৩ অধিবেশন ও কর্মপদ্ধতি

১.৭.৪ কমিটি

১.৮ গণপরিষদের কার্যাবলী

১.৮.১ জনমঞ্চ ও আলোচনা সভা হিসাবে গণপরিষদ

১.৮.২ আইনসভা হিসাবে দায়িত্ব পালন

১.৮.৩ সংবিধান রচনার কাজ ঃ প্রস্তাবিত সংবিধান ও তার বৈশিষ্ট্য

১.৯ গণপরিষদের ভূমিকার মূল্যায়ন

১.৯.১ সারাংশ

১.৯.২ অনুশীলনী

১.৯.৩ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন

- আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক অত্যন্ত কৌতূহলপ্রদ ও তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়—স্বাধীন বারতের সংবিধান রচনার প্রেক্ষাপক্ষ ও প্রস্তুতিপর্ব;

- সংবিধান সভা হিসাবে গণপরিষদ সম্পর্কে কংগ্রেস সহ দেশীয় রাজনৈতিক দলগুলির দৃষ্টিভঙ্গি এবং এ বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব;
- গণপরিষদের গঠনপ্রালী ও কার্যপদ্ধতি;
- গণপরিষদের বিভিন্ন কাজ, বিশেষত সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা;
- ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের বিচারে গণপরিষদের স্থান ও প্রভাব।

১.১ প্রস্তাবনা

ইতিপূর্বে আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসের নানা পর্যায় ও পর্বের ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় ঘটেছে। এবারে আমরা আলোচনা করব আধুনিক ভারতের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব নিয়ে। স্বাধীন ও নতুন ভারত গঠনের প্রথম ও প্রধান উদ্যোগ হল দেশ শাসন ও পরিচালনার উৎকৃষ্ট বিধিব্যবস্থা গড়ে তোলার ইচ্ছা, এবং এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এই ইচ্ছা বাস্তবায়িত হল একটি সংবিধান সভা বা গণপরিষদ (Constituent Assembly) সৃষ্টি ও সংবিধান রচনার মাধ্যমে। গণপরিষদ সৃষ্টি ইতিহাস দিয়ই আমরা শুরু করব বর্তমান এককের আলোচনা। গণপরিষদের প্রয়োজন কেন এ সম্পর্কে দু-চার কথা জানার পর এক্ষেত্রে ভারতীয় ভাবনা কি ছিল সে বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। প্রসঙ্গত জাতীয় কংগ্রেসের বিভিন্ন আন্দোলন ও জাতীয় কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনের প্রস্তাবে এ বিষয়ে কী কী দাবি ছিল বা জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব এ নিয়ে কি ভেবেছেন সে বিষয়ে আলোকপাত করা হবে। গণপরিষদ সম্পর্কে মুসলিম লিগের দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল সেটি আমাদের বিচার্য। গণপষিদে দেশীয় রাজ্যের অংশগ্রহণের প্রশ্নটিও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। গণপরিষদ সম্পর্কে বর্তমান এককের আলোচনার একটি বিশেষ অংশ জুড়ে থাকবে এক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসকের মনোভাব কি ছিল তার বিবরণ। এর পর একে একে আলোচনায় আসবে গণপরিষদের গঠনপ্রণালী, কার্যপদ্ধতি ও ভূমিকা। যেহেতু সংবিধান রচনাই ছিল গণপরিষদের মুখ্য কাজ বা দায়িত্ব, তাই এই বিষয়টি বর্তমান আলোচনায় অতিরিক্ত গুরুত্ব পাবে। গণপরিষদ রচিত সংবিধানের রূপরেখাটির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় আপনাদের সামনে তুলে ধরা হবে। বর্তমান এককের শেষ অংশে সংবিধান বিশেষজ্ঞ, রাজনীতি ও ইতিহাসের গবেষকদের বিচার-বিশ্লেষণকে সামনে রেখে গণপরিষদের কাজের মূল্যায়ন করা হয়েছে।

১.৩ গণপরিষদ সৃষ্টির ইতিহাস

আধুনিক ভারতের ইতিহাসে একটি দীর্ঘ সময় কেটে গেছে স্বাধীনতা ও স্বরাজের ভাবনাকে কিভাবে কার্যকর করা যাবে তা নিয়ে মতবিরোধ ও বিতর্ক করে। জাতীয় আন্দোলনের কংগ্রেস নেতৃবর্গ, মুসলিম লিগ,

ব্রিটিশ সরকার সকলেই ছিলেন এই বিতর্কের শরিক। ব্রিটিশ প্রবর্তিত ভারত-শাসন আইন বা সংস্কারের নীতির সাহায্যে স্বাধীনতা লাভ সম্ভব নয়, স্বরাজই স্বীনতার মূল শর্ত—ধীরে ধীরে জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে এই ভাবনাই প্রবল হয়ে উঠেছিল। জাতীয় কংগ্রেসের এই স্বরাজ ভাবনারমধ্যেই ছিল গণপরিষদ সৃষ্টির মূল উপকরণ। জাতীয় আন্দোলনের সংগঠিত মঞ্চ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও কংগ্রেস নেতৃত্বের তরফে এক্ষেত্রে কি উদ্যোগ বা প্রস্তুতি নেওয়া হয়েচিল তার কিছু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

১.৩.১ গণপরিষদের প্রয়োজন

সাধাণ অর্থে গণপরিষদ হল সংবিধান রচনার উদ্দেশ্য মিলিত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের এক সভা। ব্যাপক অর্থে গণপরিষদ হল সেই দায়িত্বশীল সংস্থা যার কাজ একটি স্বাধীন জাতির চিন্তা-বাবনা ও আশা-আকাঙক্ষাকে রূপদান করা। গণপরিষদ রচিত সংবিধানের মাধ্যমেই স্বাধীন জাতি যাত্রা শুরু করে এবং এগিয়ে চলে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে। সংবিধান স্ব-শাসন ও সুশাসনের হাতিয়ার, নিয়ন্ত্রিত ও দায়িত্বশীল শাসনের সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও নীতি। এর মাধ্যমেই প্রতিফলিত হয় সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য, নাগরিক অধিকার এবং সরকার ও নাগরিকের সম্পর্ক। গণপরিষদ রচিত সংবিধান কেবলমাত্র একটি আইনগত দলিল বা আদালতগ্রাহ্য কিছু নিয়মাবলীর সমষ্টি নয়। সংবিধান জননৈতিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ, সমাজ-সংহতির দর্পণ। সংবিধান দেশ গঠন এবং সমাজ নির্মাণের প্রত্যয়; আবেগ আর কিছু তত্ত্বকথা দিয়ে সংবিধান রচনার কাজ চলে না। আবার ইতিহাসের অন্ধ অনুসরণ করে বা বাইরে থেকে গ্রহণ বা অনুকরণ করে সংবিধান রচনার কাজে সাফল্য পাওয়া যায় না। সংবিধান রচনার কাজে প্রয়োজন কঠোর পরিশ্রম আর ব্যাপক প্রস্তুতি। স্বাধীন দেশের জন্য সংবিধান রচনার এই গুরুদায়িত্ব বহন করে গণপরিষদ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাংবিধানিক কনভেনশন (Constitutional Convention) বা ফ্রান্সের জাতীয় কনভেনশন (National Convention) সংবিধান রচনার উদ্দেশ্য নিয়েই গঠিত হয়েছিল। উভয় দেশেই জাতীয় স্বাধীনতা, গণসংগ্রাম ও গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি আনুগত্য নিয়ে এই সংস্থা দুটি সংবিধান রচনার কাজে উদ্যোগী হয়। পাশ্চাত্যের এই গণতান্ত্রিক দেশগুলির মতোই ভারতেও স্বাধীনতা সংগ্রামের অভিজ্ঞতা আর দেশ পরিচালনার নতুন ভাবনায় প্রভাবিত হয়ে সংবিদান রচনার প্রস্তুতি নেন গণপরিষদের সদস্যরা। স্বরাজ ও স্বশাসনের আন্দোলন ও দাবির সূত্র ধরেই উঠে আসে গণপরিষদ সৃষ্টি আর সংবিধান রচনার উৎসাহ। শেষ পর্যন্ত নানা ঐতিহাসিক ঘটনা, বিতর্ক, প্রতিক্রিয়া আর প্রত্যাশার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হল গণপরিষদ। পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে ৯ ডিসেম্বর, ১৯৪৬। ১৯৪৬—থেকে ১৯৪৯ দীর্ঘ তিন বছরে কঠোর পরিশ্রম আর প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে রচিত হল স্বাধীন ভারতের সংবিধান।

১.৩.২ ভারতীয় ভাবনা ঃ ১৯০৬ সালের জাতীয় কংগ্রেসের প্রস্তাব

১৯০৬ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (Indian National Congress) দাদাভাই নওরোজীর (Dadabhai Naoroji) সভাপতিত্বে যে চারদফা কর্মসূচীর (Four-point Programme) কথা ঘোষণা করে তার প্রথমটি ছিল স্বরাজ (অন্য তিনটি কর্মসূচী ছিল স্বদেশী, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা)। সন্দেহ নেই, এই স্বরাজ কথাটির মধ্যেই ছিল স্বাধীনতার মাধ্যমে স্ব-শাসনের অধিকার অর্জন এবং নিজের মত ও পথ অনুসারে সংবিধান রচনার এক প্রবল ইচ্ছা। ১৮৯৫ সালেই বালগঙ্গাধর তিলক (Balgangadhar Tilak) 'স্বরাজ বিল' নামে একটি বিল এনে স্বশাসন সম্পর্কে ভারতবাসীর চেতনাতা ও প্রত্যাশাকে জাগ্রত করতে চেয়েছেনঙ্গ ১৮৯২ সালের ভারতীয় পরিষদ আইনে (Indian Concils Act, 1892) পরিষদের কাজকর্মে ভারতীয়করণ (Indianization) বা গণতন্ত্রীকরণ (Democratization) কোনটিরই তেমন কোন ছাপ ছিল না, আইনসভার কাজকর্মেও দায়িত্বশীলতার প্রকাশ ঘটেনি। ব্রিটিশ সাংবিধানিক শাসন আর সংস্কার প্রস্তাব দিয়ে যে ভারতের জাতীয় আন্দেলনের গতিকে রুদ্ধ করা সম্ভব নয়—তিলকের নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসের একটি গোষ্ঠী এই ভাবনাকে লালন করেছে। এই ভাবনারই স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে ১৮৯৫ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে। তিলক স্বরাজের পক্ষে দাবি তুললেন। ব্রিটিশ সরকারের স্বাস্থ্য ও জন-নিরাপত্তা নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে তিলকের নেতৃত্বে বিপ্লবী যুবকর্মীরা সংগঠিত আন্দোলন শুরু করেন। বম্বে প্রেসিডেন্সীতে হিংসাত্মক বিক্ষোভের মুখে ব্রটিশ প্রশাসন রীতিমত চাপে পড়ে যায়। বিপ্লবী আন্দোলনের প্রসারকে রুদ্ধ করতেই ঔপনিবেশিক শাসপ প্রয়োগ করলেন ষড়যন্ত্র ও নিপীড়নের কঠোর আইন। বিনা বিচারে ১৮ মাস কারারুদ্ধ হলেন তিলক।

প্রান্তলিপি ঃ কেশরী (Keshari) পত্রিকায় তিলকের ঘোষণা 'স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার' ('Swaraj is my birth right') এবং ১৮৯৫ সালের স্বরাজ বিল এক অর্থে মানবিক অধিকার সংক্রান্ত প্রথম দাবি। ব্রিটিশ সাংবিধানিক পন্থা বা ব্যবস্থা মেনে ভারতবাসীর আর চলতে চায় না; একথাই এই দাবিতে প্রতিষ্ঠিত।

তিলকের নেতৃত্বে পুনা বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের মধ্যেই ছিল ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং ব্রিটিশ সাংবিধানিক পদ্ধতির উগ্র বিরোধিতা। জীয় কংগ্রেসের মধ্যে নরমপন্থা ও চরমপন্থার মতভেদ আর বিভাজন রেখাটি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। তরুন, জাতীয়তাবাদী সক্রিয় কর্মীদের কাছে স্বরাজই হল এক এবং অন্তিম লক্ষ্য। তিলক ছাড়াও এই গোষ্ঠীতে ছিলেন লালা লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ জাতীয়তাবাদী নেতা। অন্যদিকে গোপাল কৃষ্ণ গোখলের নেতৃত্বে কংগ্রোসের সরকারি গোষ্ঠী স্বরাজ ও প্রতিরোধ আন্দোলনকে দূরের লক্ষ্য (distant goal) বলে চিহ্নিত করলেন এবং সাংবিধানিক পথেই চলতে চাইলেন। কংগ্রেস সংগঠনের এই বিতর্ক ও বিবাদের পরিস্থতিতেই ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের আগেই বেনারাস অধিবেশনে (১৯০৫) ব্রিটিশ সরকারের নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তিলকের নেতৃত্বে সরকারের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের (Passive Resistance) প্রস্তাব গৃহীত হয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও

স্বদেশী আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়ঙ্গ গোখলে তাঁর সভাপতির ভাষণে ব্রিটিশ স্বশাসিত উপনিবেশগুলির মতো ভারতের জন্যও স্বশাসনের দাবি করেন। ইংলন্ডের যুবরাজের (Price of Hales) ভারত আগমনের পরিস্থিতিতে বেনারস কংগ্রেসে প্রতিরোধ আন্দোলনের কর্মসূচী শেষ পর্যন্ত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত হয়। বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তে সরকার অটুট থাকাতে কংগ্রেসের পক্ষে অবশ্য আন্দোলনের কর্মসূচী থেকে কোনবাবেই সরে আসার সম্ভবনা ছিল না। নরমপন্থা ও চরমপন্থার প্রবল মতভেদের পরিস্থিতিতে দলের অবশ্যম্ভাবী বিভাজন রোধ করতেই কলকাতা অধিবেশনে নরমপন্থী নেতৃত্বকে স্বশাসন তথা স্বরাজের দূরের লক্ষ্যকেই মেনে নিতে হয়।

কলকাতা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নয়, চরমপন্থীদের চাপে পড়েই যে দলকে আপোষ নীতি হিসাবে স্বদেশী, স্বরাজ আর বয়কটের প্রস্তাব নিতে হয়েছে তা বোঝা গেল কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনের (১৯০৭) মঞ্চে। সাংবিধানিক পদ্ধতি ও ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে মধ্যস্থতার পথে চলার সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত চরমপন্থী নতৃত্ব মেনে নিতে পারেনি। বিশৃঙ্খলা ও প্রবল মতভেদের বাতাবরণে দলের বিভাজন সম্পন্ন হল। দলীয় নেতৃত্বের ক্ষোভ আর ব্রিটিশ সরকারের কোপে পড়ে চরমপন্থী সাংগঠনিক ভাবনা কর্মকাণ্ড কিছুকালের জন্য স্তব্ধ হল বটে কিন্তু স্বরাজ ও স্বায়ত্তশাসনের দাবি এক দশক পরেই ফিরে এসেছে আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসের অনযতম সাংগঠনিক নীতি হিসাবে।

১.৩.৩ হোমরুল আন্দোলন

ব্রিটিশ শাসক ভারতবাসীর মনস্তত্ত্ব ও সংগ্রামী চেতনার গতিটিকে বুঝতে যে ভুল করেছে অল্পকাল পরেই তা বোঝা গেল। দমনপীড়ন আইন (The Newspaper (Incitement to offence) Act, 1908 এবং Criminal Procedure Code (Amendment) Act, 1908) বা বিভাজন ও অনুগ্রহের নীতি গ্রহণ করেই যে ভারত-শাসন সম্ভব নয় পরবর্তীকালের ঘটনাবলী থেকে তা একে একে প্রমাণিত হল। ১৯০৯ সালের ভারত-শাসন আইন (যা মর্লে-মিন্টো সংস্কার নামে পরিচিত) যে ভারতবাসীর জন্য কিছু সুবিধা (Concessions) ছাড়া কিছু নয়, এর মাধ্যমে যে এদেশে দায়িত্বশীল শাসন বা স্বশাসনের কোন সুযোগ দেওয়া সম্ভব নয়, লর্ড মর্লে নিজেই একথা স্বীকার করেন। ব্রিটশ সরকার এই আইনের মাধ্যমে ভারতকে আরও দক্ষভাবে শাসন করার কথা ভেবেছিল মাত্র। এদেশের জন্য পার্লামেন্টীয় শাসনের কোন প্রতিশ্রুতি এতে ছিল না। ভারবাসীর জন্য স্বায়ত্তশাসন নয়, এই আইন স্বায়ত্তশাসনকে বিলম্বিত করার এক সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টা মাত্র বা ব্রিটিশ শাসনকে স্থায়ত্বি দেবার এক কৌশল, জাতীয়দাবাদী নেতারা একথা ভেবেছেন।

তবে এই পর্বেও স্বদেশী আন্দোলন অব্যাহত থেকেছে, বয়কট প্রত্যাহার করা হয়নি, জনসভা ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে প্রতিরোধ সংগ্রাম চলেছে। ব্রিটিশ সংস্কার নীতির একটি ইতিবাচক ফল অবশ্য বঙ্গভঙ্গ রদ। তবে স্বরাজ বা স্বায়ত্তশাসনের ভাবনা রদ হয়নি। স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে নবরূপে ফিরিয়ে আনলেন অ্যানি বেসান্ত (Annie Besant)। বেসান্তের কৃতিত্ব হল কংগ্রেসের বিরোধী দুই গোষ্ঠীকে একত্রে এই

আন্দোলনে সামিল করা এবং আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারায় ভারতবাসীকে স্বাদেশিকতা ও স্বশাসনের (Home Rule) ভাবনায় জাগ্রত করা। সন্দেহ নেই স্বাধীন ভারতবর্ষে আগামী দিনের ভারতবর্ষে শাসনের রূপরেখা কি হবে তার এক আভাষ হোমরুল আন্দোলনে ছিল। বেসান্তের হোমরুল আন্দোলনে তিলকের হোমরুল বিলের মানবিক অধিকারের দাবি যে নতুন করে উঠে এসেছে। হোমরুল সংক্রান্ত প্রসাতব অবশ্য কংগ্রেসের দলীয় মঞ্চে তেমন সাড়া জাগাতে পারে নি। তিলক ছাড়া অন্য কারোর কাছ থেকে এ প্রশ্নে তেমন উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া আসে নি। ভারতে দায়িত্বশীল শাসন ও সাংবিধানিক সংস্কার নিয়ে লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের কাছে আইনসভার ১৯জন ভারতীয় সদস্যের দাবিপত্র (Memorandum) বা স্বাধীনতা ও সংস্কার বিষয়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের চুক্তি (Lucknow pact, 1916) ছাড়া ওই পর্বের স্বাধীনতা আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ছিল না।

১.৩.৪ অসহযোগ আন্দোলন ও গান্ধীজির স্বরাজভাবনা

শুধুমাত্র সাংবিধানিক সংস্কার আর প্রচলিত আপোষ ও অনুগরহের নীতি যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্যে পথ নয়—পরবর্তী কালের ঘটনাবলী থেকে তার পরিচয় মেলে। ব্রিটিশ শাসননীতি ও কূটকৌশলের জবাব দিতে গড়ে উঠেছে বিপ্লববাদ, সন্ত্রাসবাদ ও গুপ্ত সংগ্রামী সংগঠন। স্বাধীনতা আন্দোলনের এই চরমপন্থার গতিকে রুদ্ধ করতেই ব্রিটিশ সরকার নানা নিপীড়নমূলক আইন (এদের মধ্যে রাওলাট অঅইন, ১৯১৯ অন্যতম) প্রণয়ন করে। এই পর্বেই ভারতীয় রাজনীতিতে গণ-আন্দোলনের জোয়ার নিয়ে এলেন মহাত্মা গান্ধী। দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অভিজ্ঞতাকে এদেশে প্রয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কৃষক, শ্রমিকের দাবি আদায়ের আন্দোলনেও নিজেকে যুক্ত করলেন। গান্ধীজির নেতৃত্বে কংগ্রেসের সাংগঠনিক পুনরুজ্জীবন ঘটল, স্বাধীনতা ও স্বরাজের দাবি নতুন গতি পেল। জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা বা নিপীড়মূলক, আইনের বিরূপ প্রতিক্রিয়াকে সামাল দিতে মণ্টফোর্ড রিপোর্টের ভিত্তিতে (মন্টাগু ও চেমন্‌ফোর্ড রিপোর্টকে একত্রে মন্টফোর্ড, রিপোর্ট বলা হয়) ব্রিটিশ সরকার ভারত-শাসন আইন, ১৯১৯ প্রবর্তন করে। এই আইনে ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক গড়ন ও স্বায়ত্তশাসন নিয়ে কিছু গঠনমূলক প্রস্তাবের সুপারিশ ছিল। তবে দ্বৈতশাসন (Dyarchy) ও দায়িত্বশীল শাসনের কথা বলা হলেও কার্যক্ষেত্রে এই আইন স্থিতাবস্থার পরিবর্তন আনে নি। যুক্তরাষ্ট্রের নীতি মেনে প্রাদেশিক সরকারের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয় নি, প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা অর্পিত ক্ষমতা (Delegated powers) মাত্র। ভারত সচিবের (Secretary of State for India) অবাধ নিয়ন্ত্রণ দায়িত্বশীল শাসনের পরিপন্থী ছিল।

> প্রান্তলিপি ঃ বৈপ্লবিক ও সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসাবে দেশের মধ্যে যুগান্তর ও অনুশীলন সমিতি এবং দেশের বাইরে লালা হরদয়ালের গদ্দর পার্টি (Goddar Party) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। বাঘাযতিন, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্লচাকি, সাভারকার ভ্রাতৃদ্বয়, অরবিন্দ ঘোষ, মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ এই বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ফসল।

এই পরিস্থিতিতেই গান্ধীজির স্বরাজভাবনা একান্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই স্বরাজের আদর্শ ও বাণীতে উৎসাহিত হয়েই প্রায় দুঁদশক পরে একটি দেশজ সংস্থা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে গণপরিষদ। গান্ধীজি যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারত-শাসন আইন অপর্যাপ্ত, অসন্তোষজনক এবং হতাশাজনক। তবুও সত্যাদর্শী গান্ধীজি ধৈর্য হারায় নি। যতশীঘ্র সম্ভব একটি দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংস্কারের পথেই কাজ করে যেতে হবে—এই ছিল তাঁর আহ্বান। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের রক্ত তখনও শুকোয়নি, ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে দায়িত্বপূর্ণ সহযোগিতার (Responsive Cooperation) পথেইতিনি চলতে চেয়েছেন। কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের দায় গ্রহণ না করে যখন ব্রিটিশ সরকার ঘটনাটিকে 'an error of judgement' বলে উপেক্ষা করল, হত্যাকাণ্ডের ঘাতকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে দ্বিধা করল, এমনকি এই নারকীয় ঘটনায় মৃতদের পরিবারগুলিকে কোন ক্ষতিপূরণ দিতেও আপত্তি করল, তখন গান্ধীজি আর স্থির থাকতে পারেন নি। ইতিমধ্যে তিলকের মৃত্যু ঘটেছে, কংগ্রেস সংগঠনে গান্ধীজির অপ্রতিহত প্রভাব কায়েম হয়েছে, পন্থা কিছুটা ভিন্ন হলেও তিলকের স্বরাজ ভাবনাই ফিরে এল গান্ধীজির হাত ধরে।

১৯২০ সালের সেপ্টম্বর মাসে কলকাতার বিশেষ অধিবেশনে গান্ধীজির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব ও কর্মসূচী গৃহীত হল। লালা লজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় কংগ্রেস তার পূর্বেকার শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের মাধ্যমে স্বশানের লক্ষ্য ছেড়ে অহিংস অসহযোগিতার পথে স্বরাজ অর্জনের ডাক দিল। কংগ্রেসের নাগপুর বার্ষিক অধিবেশনে (ডিসেম্বর, ১৯২০) গান্ধীজির অসহযোগের পথে স্বরাজের ডাক ব্যাপক সমর্থন পেল। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, ব্রিটিশ শাসনের অধীনে স্বরাজ অর্জনের সম্ভাব্যতা নিয়ে প্রশ্ন না তুললেও প্রয়োজনে ব্রিটিশ শাসনাধীনে না থেকেও অর্থাৎ বাইরে থেকেও স্বরাজ অর্জন যে অসম্ভব নয় গান্ধীজি এই সত্য উপলবিঢধ করতে পেরেছেন। ১৯২২ সালে *Young India* পত্রিকায় স্বরাজ সম্পর্কে তিনি যে ভাবনা প্রচার করেছেন, তা ওই উপলব্ধিরই বলিষ্ঠ প্রকাশ। স্বরাজের লক্ষ্যেই ব্রিটিশরাজের সরকারি পদ, সম্মান, নির্বাচন, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, আদালত ইত্যাদি বয়কট করার সিদ্ধান্ত হল, আর্থিক, সাংস্কৃতি ও সর্বক্ষেত্রে স্বদেশী আন্দোলনের ডাক দেওয়া হল। এক বছরের মধ্যে স্বরাজ অর্জনের সময়সীমা নির্ধারিত হল, এক ব্যাপক গণ আন্দোলনের সৃষ্টি হল। নানা নিপীড়ন, সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি করেও আন্দোলনের গতি স্তব্ধ করা যায় নি। এক অবাঞ্ছিত ঘটনা (চৌরিচৌরায় হিংসাত্মক ঘটনা) এই ঐতিহাসিক আন্দোলনের করুণ পরিসমাপ্তি ঘটালেও এই গণ-আন্দোলনের অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখেই একদিকে স্বাধীনতা আন্দোলন ও অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকারের শাসনতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পট পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রশ্ন, স্বরাজ্য পার্টির উত্থান, ১৯১৯ সালের আইনের সংস্কার ও পর্যালোচনার জন্য অনুসন্ধান কমিটি (Reform Enquiry Committee) গঠন, ডমিনিয়ন মর্যাদার প্রশ্ন, সর্বদলীয় বৈঠক, মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে সর্বদলীয় কমিটি ও সংবিধান রচনার প্রস্তাব সবকিছুই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন শাসনতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির নির্দেশক।

১৯২২ সাল ভারতবর্ষের সংবিধান রচনার প্রেক্ষাপট হিসাবে তাৎপর্যপূর্ণ। গান্ধীজির অবর্তমানে কংগ্রেসের একটি অংশ এই সময় আইনসভায় যোগদানের কথা, নির্বাচনে অংশ নেবার কথা ভাবছে। গয়া অধিবেশনে নির্বাচনে অংশ নেবার সিদ্ধান্ত পরাস্ত হলে কংগ্রেসে আবার ভাঙন দেকা দিল। এই পর্বেই চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরু প্রমুখ কংগ্রেস ছেড়ে স্বরাজ্য পার্টি গড়লেন। ১৯২২ সালে *Young India* পত্রিকায় গান্ধীজির উপলব্ধি ঃ ভারতবাসীকেই নিতে হবে তার আপন ভাগ্য নির্বাচনের দায়িত্ব। গান্ধীজি বললেন ঃ

স্বারাজ বা স্বাধীনতা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দান হিসাবে আসবে না, ভারতের নিজস্ব সত্তার পূর্ণ বিকাশ ও ঘোষণা রূপেই স্বাধীনতার আবির্ভাব ঘটবে। ("Swaraj will not be a free gift of the British Parliament; it will be a declaration of India's full self-expression.....")

গান্ধীজি যা বলতে চেয়েছেন তা হল স্বরাজের অর্থ কেবলমাত্র ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তি নয়। স্বরাজ হল জাতীয় ও ব্যক্তি গত (প্রতিটি ভারতবাসীর) আত্মোপলব্ধি ভারতবাসীর ইচ্ছার প্রকাশ ঘটবে তাদের স্বাধীন পছন্দের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে। গান্ধীজির বিশ্বাস, বিদেশী জীবনধারা ও বিদেশী শাসন—স্বরাজ উভয়ের হাত থেকেই মুক্তি চায়। ভারতবাসীরা নিজেরাই হবে তাদের আত্মিক ও রাজনৈতিক ভবিষ্যতের নিয়ন্তা। গান্ধীজির ভাবনা থেকে যে কথা উঠে এল তা হল ভারতবাসীর চাই একান্ত নিজস্ব প্রতিনধিসভা ও সংবিধান।

১.৩.৫ সর্বদলীয় বৈঠক ও সংবিধান কমিটি

গণপরিষদ সৃষ্টির মূলে গান্ধীজির স্বরাজভাবনা প্রাথমিক প্রেরণা হলেও সমসাময়কি অন্যান্য কিছু ঘটনা বা প্রচেষ্টা থেকেও গণপরিষদের ধারণা উৎসারিত হয়েছে। ১৯১৯ সালের ভারত-শাসন আইনে আইনটি চালু হবার ১০ বছর পরে সাংবিধানিক পরিবর্তনের জন্য বিধিবদ্ধ কমিশন (Statutory Commission) গঠন করার প্রস্তাব ছিল। কিন্তু ১৯১৯ সালে আইনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া এতটাই প্রবল ও ব্যাপক আকর নেয় যে ব্রিটিশ সরকার দুবছর আগেই কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। অসহযোগ আন্দোলন, স্বরাজ্য পার্টির দাবি, মুডিম্যান কমিটির (Muddiman Committee) ভারতীয় সদস্য তেজ বাহাদুর সপ্রু (Tej Bahadum Sapru), মহম্মদ আলি জিন্না (M. A. Jihhah) প্রমুখের অভিমত এবং উদ্ভূত রাজনৈতিক চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখেই সরকার সাংবিধানিক সংস্কারের জন্য তথ্যানুসন্ধানের প্রয়াস নেয়। তবে ভারতীয় প্রতিনিধিত্ব না থাকাতে এই কমিশনের প্রতি প্রথম থেকেই জাতীয়তাবাদী নেতারা অনাস্থা প্রকাশ

> প্রান্তলিপি ঃ ১৯২৪ সালে স্বরাজ্য পার্টির নেতা মতিলাল নেহরু কেন্দ্রীয় আইনসভায় তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন, সংবিধান রচনায় নিজেদের হাত না থাকলে কোন দেশের সংবিধান আছে এ কথা বলা যায় না।
>
> কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে স্যার মুডিম্যানের (Muddiman) সভাপতিত্বে গঠিত সংবিধান সংস্কার কমিটিতে তেজ বাহাদুর সপ্রু, প্রমুখ সংখ্যালঘিষ্ঠেরা যে মতামত দেন তাতে দ্বৈতশাসন লোপ করার কথা ছিল।

করেন। কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করে বারতসচিব লর্ড বার্কেনহেড (Lord Birdenhead) জানান ভারতবাসীর পক্ষে সর্বসম্মতভাবে সংবিধান তৈরি সম্ভব নয়, সুতরাং সরকারকেই এক্ষেত্রে দায়িত্ব নিতে হবে। স্যার জন সাইমনকে (Sir John Simon) সভাপতি করে সাত সদস্যের এক কমিশনের হাতে সংবিধান পর্যালোচনার দায়িত্ব দেওয়া হল। ইতিপূর্বে তিলক, অ্যানি বেসান্ত স্বরাজ বিলের প্রস্তাব দিয়েও ব্যর্থ হয়েছেন। লর্ড বার্কেনহেডের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এবার ভারতবাসীর পক্ষ থেকে একটি সর্বদলীয় সম্মেলন (All Party Conference) আহ্বান করা হল নিজেদের উদ্যোগে সংবিদান রচনার লক্ষ্য নিয়ে। ২৯টি সংগঠনের এই সম্মেলনে ডমিনিয়ন মর্যাদার ভিত্তিতে একটি দায়িত্বশীল সরকার গঠনের প্রস্তাব নেওয়া হল। ডমিনিয়ন মর্যাদাকেই স্বাধীনতার দ্যোতক ভাবা হল, একটি কমিট গড়ে অধিকার বিল (Bill of Rights) ও অন্যান্য কি সাংবিধানিক ব্যবস্থা নেবার কথা ভাবা হল। ফেব্রুয়ারি সম্মেলনের বিতর্ক ও জটিলতা দূর করতে আবার মে মাসে সর্বদলীয় সম্মেলন ডাকা হল। এই সম্মেলনে মতিলাল নেহরুকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠিত হল এবং এই কমিটিকে সংবিধান রচনার দায়িত্ব দেওয়া হল। মতিলাল নেহরু কমিটি ভারতবাসীর জন্য একটি খসড়া সংবিধান পেশ করে। ব্রিটিশ ভারত ও রাজ্যগুলিকে নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচের ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রে ও রাজ্যে দায়িত্বশীল প্রতিনিধিমূলক শাসনের সুপারিশ করে এই কমিটি। কেন্দ্র দ্বিপরিষদ সম্পন্ন আইনসভা, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার, ভাষায় ভিত্তিতে রাজ্যের পুনর্গঠন, অধিকার বিল, সংখ্যালঘুর সংরক্ষণ ইত্যাদিরও সুপারিশ করে কমিটি এই সংবিধানে। ১৯২৮ সালের আগস্ট মাসে লক্ষ্ণৌ সম্মেলনে নেহরু সংবিধান অনুমোদন পায় এবং পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সংবিধান বিষয়ে পৃথকভাবে ভাবনাচিন্তা করে।

১.৩.৬ জাতীয় কংগ্রেসের বিভিন্ন সম্মেলনে গণপরিষদের দাবি

বিগত শতকের (বিংশ শতকের) তিরিশের দঐক থেকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আনুষ্ঠানিক নীতি ও প্রধান দাবি হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে গণপরিষদের ধারণা। ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেস কার্যকরী কমিটি (Congress Working Committee) মতিলাল নেহরু কমিটির রিপোর্ট অনুমোদন করলে কংগ্রেস সংগঠনে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। জওহরলাল নেহরু প্রতিবাদে কংগ্রেসের সম্পাদক পদ ত্যাগ করেন। জওহরলাল নেহরুর মতে, কংগ্রেস কার্যকরী কমিটির এই সিদ্ধান্ত ১৯২৭ সালে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের মাদ্রাজ বার্ষিক অধিবেশনের সিদ্ধান্তের পরিপন্থী। মাদ্রাজ অধিবেশনে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতা (স্বরাজের) দাবি করে। ডমিনিয়ন মর্যাদা (Dominion Status) চেয়ে সংবিধানের যে খসড়া মতিলাল হেরু কমিটি পেশ করেছে তা সম্পূর্ণভাবেই পূর্ণ স্বরাজের দাবি থেকে বিচ্যুতি। কংগ্রেসের ডিসেম্বর অধিবেশনে নেহরু রিপোর্ট অনুমোদিত হলে ব্রিটিশ সরকারের কাছে এটাই প্রতিপন্ন হল যে, ভারতের সাংবিধানিক পথ ও পন্থা হল ডমিনিয়ন মর্যাদা। ব্রিটিশ শ্রমিকদলের প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের (Ramsay MacDonald) ডাকে দেশে ফিরে লর্ড আরউইন (Lord Irwin) এরকম অভিমতই পেশ করেন। সাইমন কমিশনের রিপোর্ট ও আরউইনের

অভিমতের ভিত্তিতে সরকার সিদ্ধান্ত নিল ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্পর্কে মতামত যাচাই করতে ব্রিটিশ ভারত ও ভারতীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে গোল-টেবিল বৈঠক হবে। কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটির অধিকাংশ সদস্য এ বিষয়য ইতিবাচর সাড়া দিলেও জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসু পূর্ণ স্বাধীনতার প্রশ্নেই অটল রইলেন। মতিলাল নেহরু রিপোর্ট মেনে নেবার জন্য কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের কাছে যে সময়সীমা দিয়েছিল (ডিসেম্বর ৩১, ১৯২৯) সেই সময়সীমা অতিক্রান্ত হল। গান্ধীজি ও জিন্নার উপস্থিতিতে ভাইসরয়ের সঙ্গে যে বৈঠক (ডিসেম্বর ২৩, ১৯২৯), সেই বৈঠক থেকে কোন স্পষ্ট প্রস্তাবও এল না। ভারতীয় নেতারা হতাশ হলেন। সংবিধান রচনার প্রয়াস বাধা পেল।

পরবর্তীকালের ঘটনাগুলি ভারতের সংবিধানতন্ত্রের ইতিহাসে স্মরণীয়। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেস লাহোরে অধিবেশন ডেকে জওহরলাল নেহরুকে সভাপতি রে যে সিদ্ধান্ত নিল তা অভিনব। মতিলাল নেহরু রিপোর্টের সমগ্র প্রস্তাব বর্জন করা হল। কংগ্রেস সংবিধানের ১ ধারায় বর্ণিত 'স্বরাজ' বলতে যে পূর্ণ স্বাধীনতাই বোঝাবে একথা বলা হল। কংগ্রেস কর্মীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচনে অংশ নেওয়া থেকে বিরত থাকতে আহ্বান জানানো হ। আইনসভা বা আইনসভার কমিটি থেকে কংগ্রেস সদস্যদের পদত্যাগ করতে বলা হল। সর্ববারতীয় কংগ্রেস কমিটিকে লাহোর কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচী নেবার অধিকার দিল। ২৬ জানুয়ারি দিনটিকে ভারতের স্বাধীনতা দিবস হিসাবে গণ্য করার প্রস্তাব নেওয়া হল এবং পূর্ণ স্বরাজ অর্জনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল কংগ্রেসকর্মীরা।

উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং অর্থনৈতিক সংকটের জটিল আবর্তে সারা ভারত উত্তাল হল। বল্লভভাই প্যাটল গুজরাটের সুরাটে কৃষকদের নিয়ে সত্যাগ্রহের ডাক দিয়েছেন। কমিউনিস্টরা কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনে সক্রিয় হয়েছেন। সরকার কমিউনিষ্টদের মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করেছে। কংগ্রেসের মধ্যে সমাজতন্ত্রী ভাবনার প্রসার ঘটেছে। সর্বভারতীয় শ্রমিক সংঘ কংগ্রেসের (All India Trade Union Congress) সভাপতি হিসাবে জওহরলাল নেহরু ভারতে স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে প্রতিষ্ঠার ডাক দিলেন। গান্ধীজি তাঁর পূর্ববর্তী দ্বিধা কাটিয়ে উঠে সারা ভারতবর্ষে সত্যাগ্রহের ডাক দিলেন। কংগ্রেস কার্যকরী কমিটি গান্ধীজিকে আইন আমান্য আন্দোলনের পূর্ণ কর্তৃত্ব দিলেন। ভাইসরয়ের কাছে উদ্ভূত পরিস্থিতির অবসান ঘটানে আবেদন জানিয়ে ব্যর্থ হলে গান্ধীজি একরকম বাধ্য হয়েই লবণ আইন অমান্য শুরু করলেন। শুরু হল গান্ধীজির ডাণ্ডি অভিযান ও সত্যাগ্রহ। সর্বস্তরের মানুষ এই আন্দোলনে অংশ নিল। সরকার ব্যাপক দমন পীড়ন নীতি প্রয়োগ করেও এই আন্দোলন দমাতে পারে নি। কংগ্রেসের নেতৃবর্গ গ্রেপ্তার হলেন, কংগ্রেসের কমিটি ও শাখা সংগঠনগুলি নিষিদ্ধ হল। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার আবার গোলটেবিল বৈঠক ডেকে ভারতে ঔপনিবেশিক মর্যাদা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। উপনিবেশের মর্যাদা দিয়ে ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠনের ব্যাপারে অগ্রসর হবেন বলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড জানালেন।

আরউইনের সঙ্গে চুক্তি করে গান্ধীজি আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন। বিনিময়ে কংগ্রেসের ওপর নিষেধাজ্ঞা উঠল। সুভাষচন্দ্র বা জওহরলাল নেহরু এই চুক্তি না মানলেও, করাচি কংগ্রেসে (১৯৩১ মার্চ) গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুমোদিত হল। তবে কংগ্রেসের স্বাধীনতার প্রস্তাবকে গুরুত্ব না দিয়ে ব্রিটিশ সরকার সাংবিধানিক সংস্কারের পথেই অগ্রসর হলেন। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকেও কংগ্রেসের দাবি অস্বীকৃত হল। গান্ধীজি খালি হাতে ফিরে এলেন। কংগ্রেস কার্যকরী কমিটি আবার আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার প্রস্তাব নিল। এই পর্বে সরকারি তরফে ব্যাপক দমন পীড়ন চলেছে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার (Communal Award) মাধ্যমে ভারতবর্ষে বিভেদেনর রাজনীতি কার্যকর করার চেষ্টা চলেছে, আবার শাসন-সংস্কার আইন (Reform Act) আর সংস্কারের শ্বেতপত্র (White Paper on Reforms) দিয়ে জাতীয় নেতাদের তুষ্ট করার চেষ্টাও হয়েছে।

গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থতা, ব্রিটিশ সরকারের দীর্ঘসূত্রিতা, গান্ধীজির আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত কংগ্রেসের যুবশক্তি, বিশেষত জওহরলাল নেহরু ও সুভাষ বসুকে জাতীয় আন্দোলন ও স্বাধীনতার প্রশ্নে নতুনভাবে ভাবতে প্ররোচিত করেছে। এই পর্বেই গণপরিষদ ও সংবিধান সম্পর্কে কংগ্রেসের ভাবনা তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৯—এই পাঁচ বছরে গণপরিষদ সম্পর্কে কংগ্রেস তার সুস্পষ্ট ভাবনা প্রকাশ করে।

১৯৩৪ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস আনুষ্ঠানিক নীতি হিসাবে গণপরিষদের দাবি করে। সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি ১৯৩৪ সালের মে মাসে নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং পার্লামেন্টীয় বোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নভেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে প্রদেশগুলিতে দল অভাবনীয় সাফল্য পায়। নির্বাচনে সাফল্যের সুযোগেই কংগ্রেস গণপরিষদ গঠনের ঐতিহাসিক দাবি রাখে। সাংবিধানিক ও সরকারি প্রস্তাবের শ্বেতপত্র প্রত্যাখান করে কংগ্রেস কার্কারী সমিতি জানায় শ্বেতপত্রের একমাত্র বিকল্প হল সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত গণপরিষদের দ্বারা রচিত একটি সংবিদান ("The only satisfactory alternative to the white paper is a constitution drawn up by a Constituesnt Assembly elected on the basis of adult franchise,....")। গোলটেবিল বৈঠক ব্যথ হবার পর জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন ভারতে জনগণই ভারতের ভবিষ্যৎ-নিয়ন্তা। সুতরাং তাদের হাতেই ভারতের সংবিধান রচনার ক্ষমতা থাকা উচিত। ১৯৩৬ সালে ফৈজপুর সর্ম্মেনে গণপরিষদ গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করে কংগ্রেস বলে, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত গণপরিষদ ভারতে প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে। ফৈজপুর অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে নেহরু স্পষ্টভাষায় জানান যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে কংগ্রেস নির্বাচনে লড়ছে না বা প্রাদেশিক সরকারে যোগদানের জন্যও নয়। সংবিধানতন্ত্র বা সংস্কারবাদের পথে চলার কোন ইচ্ছা আমাদের নেই। ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের প্রস্তাবের

বিরোধিতাই ামাদের লক্ষ্য। ১৯৩৭ সালের ১ মার্চ কংগ্রেস কার্যকরী কমিটির প্রস্তাবে বলা হল, পূর্ণ স্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতাই কংগ্রেসের লক্ষ্য। অঅইনসভায় নতুন সংবিধানের জন্য সংগ্রাম করা, ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রস্তাবটির প্রতিরোধ করা এবং গণপরিষদের জন্য জাতির দাবিকে প্রতিষ্ঠা করাই কংগ্রেসের লক্ষ্য। ১৯৩৭ সালে ২০ মার্চ কংগ্রেস জনপ্রতিনিধিদের সর্বভারতীয় জাতীয় কন?ভনশনে প্রায় একই অনুভূতির কথা শোনা যায়। প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের স্বার্থেই ভারতের জনগণকে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। গণপরিষদর মাধ্যমে ভারতের জনগণই এই ধরনের রাষ্ট্রভ্যস্থাকে রূপ দেবে। নির্বাচনে জয়লাভের পর ৬টি রাজ্যে মন্ত্রিসভা গড়ে কংগ্রেস যে সব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয় তার মধ্যে অন্যতম হল স্বাধীন ভারতের জন্য সামাজিক অর্থনৈতিক সংস্কারের কর্মসূচী গ্রহণ। প্রাদেশিক স্বাতন্ত্রের ব্রিটিশ আইনের সুযোগ নিয়ে কংগ্রেস প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছে ভারতবাসী নিজেদের বিষয় সংগঠিত ভাবে, দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করতে সমর্থ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি বা মুসলিম লিগের সঙ্গে বিচ্ছেদ কংগ্রেসের রাজনৈতিক দাবি সাফল্যের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করার পথে সাময়িক বাধা সৃষ্টি করেছে সন্দেহ নেই। তবে গণপরিষদের দৃঢ় দাবি থেকে কংগ্রেস সরে আসে নি। ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে সাধারণ ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ থেকে সম্ভব না হলেও, কংগ্রেস লড়াই চালিয়েছে নিজের সাংগঠনিক স্তরেই। এই পর্বে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও স্বাধীনতার স্বার্থেই ব্রিটিশ সরকারকে তার যুদ্ধ পরিকল্পনা নিয়ে প্রশ্ন করেছে কংগ্রেস। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর ও নভেম্বর মাসে কার্যকরী কমিটি আবার ভারতের স্বাধীনতা ও গণপরিষদের দাবিতে সোচ্চার হয়েছেঙগ ২৩ নভেম্বর কংগ্রেস কার্যকরী কমিটি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানায়, যুদ্ধ চলছে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে, দেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যা বা অন্যান্য সমস্যার সমাধানের সবচেয়ে উপযোগী পথ হল গণপরিষদ। চারদিন আগে হরিজন পত্রিকায় গান্ধীজি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে একই দাবি করেছেন। News Chronicle-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে গান্ধীজি বলেছেন গণপরিষদই একমাত্র ও কার্যকর সমাধান। ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারে পাশে দাঁড়াতে কংগ্রেস রাজী হয়েছে এই শর্তে যে ভারতের স্বায়ত্তশাসনরে অধিকার যুদ্ধের পরে ব্রিটিশ সরকার মেনে নেবে এবং কেন্দ্রে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করবে (কংগ্রেস কার্যকরী কমিটির প্রস্তাব, পুনা, জুলাই ৭, ১৯৪০)। গণপরিষদই যে একমাত্র পথ, নেহরুও কংগ্রেসের পক্ষে এই কথা বার বার ঘোষণা করেছেন। ১৯৪০ সালে রামগড় কংগ্রেসে পূর্ব স্বরাজ এবং গণপরিষদ গঠনের পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। ১৯৪৬ সালে গণপরিষদ সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্তও কংগ্রেসের সাংগঠনিক প্রস্তাবে ও বার্ষিক সম্মেলনে গণপরিষদের পক্ষে দৃঢ় দাবি ছিল। ১৯৪২ সালেও সরকারের দরফে যখন কোন সমাধান সূত্র এল না বা ব্রিটিশ সরকার ডোমিনিয়ন মর্যাদার অধিক কোন দাবিতে সম্মত হল না তখন কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার রাস্তা থেকে সরে এল। ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে ওয়ার্ধায় কংগ্রেস কার্যকরী কমিটি মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিল, ভারতে ব্রিটিশ

শাসনের অবসান ঘটাতে হবে। জুলাই প্রস্তাবটিই অনুমোদিত হল বোম্বাইয়ে আগস্ট মাসের ৮ দারিখে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সভায়। শুরু হল ভারত ছাড় আন্দোলন। গান্ধীজি ডাক দিলে 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' ('Do or Die')। আপোষ, মধ্যস্ততার চেষ্টা হল কোন কোন নেতার তরফে। গান্ধীজি অনশনে বসলেন (ইতিমধ্যে তিনি গ্রেপ্তারও হয়েছেন)। অবশেষে ব্রিটিশের দরখ থেকেই এল মিমাংসা সূত্র। গণপরিষদ গঠিত হল বটে, তবে বাধাবিঘ্ন আর বিভাজনের চিহ্ন নিয়েই জন্ম নিল গণপরিষদ।

১.৪ গণপরিষদ সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব ও নীতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে গণপরিষদ সম্পর্কে ভারতীয় মন একরকম প্রস্তুতই হয়ে গেছে বলা চলে। যুদ্ধের প্রতিকূল পরিস্থিতি এই মানসিকতা সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করলেও, জাতীয়তাবাদী চেতনা ও জাতীয় মর্যাদা রক্ষায় ভারতবাসীর সংগঠিত প্রয়াস বা উদ্যোগকটি এই সময় বিশেষভাবে চোখে পড়ে। ভারতবাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি গতিলাভ করেছে দ্রুত রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দুর্বলতাও প্রকট হয়ে উঠেছে। ভবিষ্যৎ ভারত রাষ্ট্রের রূপরেখা কি হবে তা নিয়ে নবনিযুক্ত শ্রমিক দলের সরকার ও ভারতের জাতীয় নেতাদের দরাদরি ও শলা-পরামর্শ শুরু হয়ে গেল। জাতীয় নতাদের তরফে গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধান কি হবে তা নিয়ে নানা বিতর্ক ও আলোচনা হল। তেজবাহাদুর সাপ্রু, চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী (Chakrabarti Raja Gopalachari), হিন্দু মহাসভা ও আকালীদের প্রতিনিধিগণ, মহম্মদ আলী জিন্না প্রমুখের উপস্থিতিতে সর্বদলীয় সম্মেনে উদ্ভূত রাজনৈকি সংকট ও সাংবিধানিক প্রনের সমাধান সূত্র স্থির করার চেষ্ট হয়। ব্রিটিশ সরকারের তরফেও যতশীঘ্র সম্ভব স্বশাসনর অধিকার দেবার উদ্যোগ নেওয়া হল। ক্রীপ্‌স্ মিশন সাফল্য না পেলেও স্বশাসনের প্রতিশ্রুতি জাগিয়ে রেখেছিল। ওয়াভেন পরিকল্পনা, ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা গণপরিষদের ধারণাকে বাস্তবায়িত করে, গণপরিষদ আইনগতভাবে সৃষ্টি হল ১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে ভারতীয় স্বাধীনতা আইনে (The Indian Independence Act) গণপরিষদ গঠনের প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি আসে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের এক ঘোষণা অনুসারে। ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৪৬ সালে গণপরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, ২৯৬ সদস্য বিশিষ্ট গণপরিষদ গঠিত হয়। ১৯৪৬ সালের ৯ ডিসেম্বর গণপরিষদের প্রথম সভা বসে। তবে মুসলিম লীগ এই সভায় অংশ নেয় নি। এই পর্বে কংগ্রেসের নেতৃত্বেই গণপরিষদের কাজকর্ম শুরু করলেও, পরিষদরে আইনগত মর্যাদা নির্ধারিত হয় নি। সার্বভৌম সংস্থা হিসাবেও এর অবস্থান দিয়ে প্রশ্ন ছিল। কংগ্রেস ও মুসমি লিগের মতপার্থক্য, ভারত-বিভাজন ইত্যাদির কারণে অবিভক্ত গণপরিষদের ধারণা শেষ পর্যন্ত কাজ করে নি। মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাব অনুসারে ও ভারতীয় স্বাধীনতা আইন অনুসারে জন্ম নিল নতুন ভারত রাষ্ট্র। নতুন ভারত রাষ্ট্রের হয়ে সার্বভৌম ক্ষমতা নিয়ে হাজির হল গণপরিষদ।

এবার আসুন আমরা গণপরিষদ সৃষ্টির পেছনে ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব বা উদ্যোগ কি ছিল সেই অতীত ঘটনার দৃশ্য (Flash-back) দেখি। ১৯০৯ সালের ভারত-শাসন আইন আর ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীন আইন-এর মাঝের বচরগুলি সরকারি সাংবিধানিক ব্যবস্থাগুলিই আমরা এখানে দেখাবার চেষ্টা করবো। এই সাংবিধানিক ব্যবস্থাগুলির মধ্যেই গণপরিষদের দাবি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সরকারি অনুমোদ পেয়েছে বলা যেতে পারে।

১.৪.১ ১৯০৯ সালের ভারতশাসন আইন

গণপরিষদের ধারণা প্রচার না পেলেও, বিংশ শতকের প্রথম দশক থেকেই স্বরাজ অর স্বদেশীর ভাবান ছড়িয়ে পড়ে ভারতের জাতীয়বাদী আন্দোলনে। স্বরাজের ডাকেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগঠিত হল। শুধুমাত্র শাসন আর দমনের সাহায্যে এই প্রতিরোধ আন্দোলনকে নিষ্ক্রিয় করা সম্ভব নয় একথা ভেবেই ব্রিটিশ শাসকের পক্ষ থেকে একটি শাসন-সংস্কারের সুপারিশ করা হল। ১৯০৯ সালের এই শাসন-সংস্কারে (যা মর্লে-মিন্টো সংস্কার নামে পরিচিত) ভারতবাসীকে কিছু রাজনৈতিক সুবিধা বা অনুগ্রহ দেবার চেষ্টা হলেও ভারতবর্ষে কোন দায়িত্বশীল সরকার স্থাপন বা স্বশাসনের কোন প্রতিশ্রুতি ছিল না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নিরাপদ করতে ইংল্যান্ড থেকেই ভারতের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা প্রয়োজন, ভারতে কোন কর্তৃপক্ষের াতে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়, নতুন আইনে এটাই সুনিশ্চিত হল। লন্ডনের হোয়াইট হল থেকেই ভারত-সচিবের মাধ্যমে ভারতবর্ষের শাসন পরিচালনার কাজ চলবে—নতুন আইনে এটাই স্থির হল। জাতীয় কংগ্রেস ও ভারতবাসীর মনে ব্রিটিশ শাসন নিয়ে যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, নতুন এই আইনি সংস্কারে উপশম করতে চাইল নামমাত্র কিছু ব্যবস্থাপত্র দিয়ে। এগুলি হল ঃ আইন-পরিষদের আয়তন বাড়িয়ে ভারতীয়দের সেখানে সদস্যপদ দেওয়া, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণীর প্রতিধিত্বের ব্যবস্থা। গণপরিষদের মাধ্যমে সাংবিধানিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে উদ্যোগ পরবর্তীকালে লক্ষ্য করা গেছে, ১৯০৯ সালের সংস্কার আইনে তার এক ক্ষীণ আভাস ছিল, অনেকে এই মত ব্যক্ত করেন। আইনসভার সম্প্রসারণ, নির্বাচন, প্রতিনিধিত্ব—এইসব ধারণা ও ভাবনার সঙ্গে ভারতবাসীর পরিচয় ঘটল, পরিষদীয় শাসন সম্পর্কেও অভিজ্ঞতা হল, স্বরাজ, স্বাধীনতা ও পণপরিষদের পক্ষে আগামী দিনে ভারতবাসীর দাবি জোরদার হল। ব্রিটিশ শাসক অবশ্য পদ্ধতিগত জটিলতা, বিভেদমূলক নির্বাচনী ব্যবস্থা, আনুষ্ঠানিক নিয়মনীতির জালে স্বায়ত্তশাসনের মূল দাবিকে বন্দী করে রেখেছে।

১.৪.২ ১৯১৯ সালের ভারতশাসন আইন

মর্লে-মিন্টো শাসন-সংস্কারের মাধ্যমে প্রশাসনিক ও পরিষদীয় ব্যবস্থাকে প্রসারিত করার চেষ্টা হলেও, স্বশাসন বা স্বায়ত্তশাসনের কোন ভাবনা এই সংস্কারে প্রশ্রয় পায় নি। স্বরাজ ও স্বদেশীর দাবিতে ভারতবাসী অটল থেকেছে এবং সেইসঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনেও সোচ্চার ও সক্রিয় হয়েছে। একসময় স্বদেশী ও হোমরু আন্দোলনের সীমানা অতিক্রম করে জাতীয় আন্দোলন সন্ত্রাসবাদ ও বিপ্লববাদের পথে ঝুঁকেছে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও স্বৈরশাসনের উচ্ছেদ ঘাটতে বিপ্লবী সংগঠনের সৃষ্টি ও প্রসার এবং ব্রিটিশ সরকারের পুলিশী ও নিপীড়ন ব্যবস্থা ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। ইতিমধ্যে ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীজির প্রবেশ ও নেতৃত্ব গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক সম্পূর্ণ নতুন পর্বের সূচনা করেছে। অহিংস-অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনের চাপে ব্রিটিশ সরকার সামরিক আইননের পরিবর্তে দায়িত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠার পক্ষে প্রয়োজনীয় সংস্কার আইন গ্রহণের কথা ভাবতে থাকে। ১৯১৭ সালে ভারতসচিব এডউইন মন্টেগু (Edwin Montagu) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হিসাবে ভারতে স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান প্রবর্তনের কথা বলেন। এর কিছুদিন পরেই লর্ড চেমসফোর্ড (Lord Chemsford) ভারতে উদারনৈতিক শাসন প্রতিষ্ঠার পক্ষে বলেন। তৎকালীন ভারতসচিব অস্টেন চেম্বরলেনও (Austen Chamberlain) এদেশে দায়িত্বশীলন শাসনের প্রস্তাব পেশ করেন। বলা যেতে পারে মন্টেগু ও চেমস্‌পোর্ডের ভাবনায় প্রভাবিত হয়েই ব্রিটিশ সরকার ভারতে স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে যে আইন কার্যকর করে সেটিই ভারতশাসন আইন, ১৯১৯ (মন্টেগু চেমস্‌ফোর্ড আইন বা সংক্ষেপে মন্টফোর্ড আইন) নামে পরিচিত। কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে ক্ষমতা বিভাজন, আইনসভার স্বাধীনতা, পার্লামেন্টীয় পদ্ধতি, নির্বাতন—এই শাসন সংস্কারের কতকগুলি ইতিবাচক দিক ছিল সন্দেহ নেই। ভারতসচিবের একাধিপত্য বা কেন্দ্রীয় নিয়ন্তরণের ব্যবস্থা কর্যকরী হলেও এই আইন ভারতে পরিষদীয় শাসনের ভিত্তি প্রতুত করেছে ও স্ব-শাসন সম্পর্কে ভারতবাসীকে উৎসাহিত করেছে। আইনসভা, প্রতিনিধিত্ব ও সংবিধানকে সামনে রেখে এদেশে স্বায়ত্তশাসন ও দায়িত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব—১৯১৯ সালের আইনের পটভূমিতে সে আশা ব্যক্ত হল। পরবর্তীকালে স্বরাজ অর্জন ও মুক্তি সংগ্রামের ক্ষেত্রে সূচনা হল এক নতুন ও বলিষ্ঠ অধ্যায়।

১.৪.৩ সাইমন কমিশন

১৯১৯ সালের আইনে স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি থাকলেও অসচ্ছ ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য তাড়িত এই আইন শেষ পর্যন্ত ভারতবাসীকে হতাশ করেছে। ভারতবাসীর এই হতাশা ও অসন্তোষ প্রকাশ পেল কংগ্রেসের অমৃতসর অধিবেশনে, অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনে। স্বরাজের দাবিতে সোচ্চার হল গোটা ভারতবর্ষের মানুষ। গান্ধীজির নেতৃত্বে শুরু হল নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন। এক বছরের মধ্যে স্বরাজ অর্জিত হবে বলে গান্ধীজি ঘোষণা করলেন। সাংবিধানিক আন্দোলনের সীমা ছাড়িয়ে দেশী ও স্বরাজের আন্দোলন গণ-আন্দোলনে প্রসারিত হল। গান্ধীজি আন্দোলন প্রত্যাহার করলেও, শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ও ডোমিনিয়ন মর্যাদার দাবিতে মতিলাল নেহরু ও চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ্য দল (Swarajya Party) আন্দোলন ও স্বরাজ সংগঠনের কাজ চালিয়ে গেছে। বামপন্থীদের নেতৃত্বে কৃষক ও শ্রমিকের আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। ইতিমধ্যে দ্বৈতশাসনের অবসানের পক্ষে জোর সওয়াল শুরু করেন স্যার মুডিম্যানের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি। তেজবাহাদুর সপ্রু, মহম্মদ আলি জিন্না, এস. এস. আয়ার

(S. S. Ire), আর. পি. পরাঞ্জাপে (R. P. Paranjpe) প্রমুখ বিশিষ্ট জাতীয় নেতৃবর্গ দ্বৈতশাসনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন করেন। জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম নেতারা সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য যৌথ নির্বাচক মণ্ডলীর প্রস্তাব করেন। এই পরিস্থিতিতেই ব্রিটিশ সরকার সাংবিধানিক সংস্কার নিয়ে নতুনভাবে তথ্যানুসন্ধানের জন্য স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করে। সাময়িকভাবে কমিশন বিরুদ্ধতা ও বিক্ষোভের সম্মুখীন হলেও, কমিশনের রিপোর্টে সাংবিধানিক সংস্কারের কিছু প্রস্তাব ছিল। কমিশনের প্রস্তাবে দ্বৈতশাসনর অবসান ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ ছিল। ডোমিনিয়ন মর্যাদার ভিত্তিতে এদেশে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার কথা অবশ্য কমিশনের সুপারিশে ছিল না।

ভারতীয়দের পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে এদেশের জন্য সংবিধান রচনা করা সম্ভব নয়, ভারতসচিব বার্কেনহেডের এই চ্যালেঞ্জ ভারতবাসীর মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এরই ফলশ্রুতি মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে সর্বদলীয় সম্মেলন এবং এই সম্মেলনে গঠিত সংবিদান কমিটি। ভারতে গণপরিষদ ও সংবিধান রচনার প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে গঠিত এই কমিটিতে।

নেহরু কমিটির রিপোর্টকে প্রত্যাখ্যান করে জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লিগ এক বিকল্প প্রস্তাব উপস্থিত করে। ইতিমধ্যে জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেস লাহোরে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পেশ করে। গান্ধীজির নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তুতিও শুরু হয় প্রায় একই সঙ্গে। সত্যাগ্রহ আন্দোলন ও ব্রিটিশ সরকারের দমননীতির প্রেক্ষাপটে যে অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তারই ফলে ইংরেজ সরকার গোলটেবিল বৈঠকের আপসমূলক উদ্যোগ নেয়।

১.৪.৪ গোলটেবিল বৈঠক

প্রথম গোলটেবিল বৈঠক (১২ নভেম্বর, ১৯৩০) ইংরেজ সরকারের আশ্বাস ছিল ডোমিনিয়ন মর্যাদাসহ ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গঠন। গান্ধীজি-আরউইন চুক্তির শর্ত মেনে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করা হল। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক (৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১) সাংবিধানিক সংস্কারের প্রস্তাবের পক্ষে উদ্যোগ নেওয়া হলেও, ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। আপস-মীমাংসায় ভারতীয়দের প্রাপ্তি ছিল শূন্য। গান্ধীজি ভারতে ফিরে এলেন। নবনিযুক্ত ভাইসরয় লর্ড উইলিংডন (Willingdon) শাসন-সংস্কারের প্রশ্নে উদাসীন ছিলেন। গান্ধী-আরউইন যুক্তি কার্যকর হল না। ভারতের জাতীয়তাবাদী আবেগ মূল্য না পাওয়াতে আইন অমান্য আন্দোলন আবার শুরু হল। ব্রিটিশ সরকার দমলমূলক নীতি গ্রহণ করে পরিস্থিতিকে আরও অস্থির ও জটিল করে তুললেন। এই পর্যায়ে ব্রিটিশ সরকারের নতুন নীতি হল সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (Communal Award), তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক ও সাংবিধানিক সংস্কার বিষয়ে শ্বেতপত্র (White Papers on Constitutional Reforms) প্রকাশ।

১.৪.৫ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও অন্যান্য শাসন-সংস্কার

আইন-অমান্য আন্দোলন চলাকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড আইনসভার সদস্য বণ্টনের এক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ; বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনক্ষেত্র ও আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা হল। তীব্র প্রতিক্রিয়ার মুখেও ব্রিটিশ সরকার তার সিদ্ধান্তে অটল ছিল। পুনাচুক্তি (Puna Pact) অনুসারে অনুন্নত শ্রেনীর জন্য অধিক আসন সংরক্ষণের ও পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করে অবস্থা সাময়িকভাবে সামাল দেওয়া হলেও অচিরেই সরকারকে তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করে যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী গড়ার এক উদ্যোগ নিতে হল। বৈঠকে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের এক শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হল। স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে না হলেও শ্বেতপত্র ভারতে শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করে। যুক্তরাষ্ট্র, প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য ও ব্রিটিশ সরকারের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে শ্বেতপত্রে বিস্তারিতভাবে বলা হয়। শ্বেতপত্র নিয়ে তথ্যানুসন্ধানের জন্য গঠিত হল লর্ড লিনলিথগোর (Lord Linlithgow) নেতৃত্বে যৌথ পার্লামেন্টীয় কমিটি (১৯৩৪)। এই কমিটিই ভারতে নতুন ধরনের শাসন-সংস্কারের সবুজ সংকেত দেয়। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের রূপরেখা প্রস্তুত হল : স্বশাসন না দিলেও নতুন আইনে স্বশাসন ও সংস্কারের প্রতিশ্রুতি ছিল। ইংরেজ সরকারের উদারনীতি ও ইতিবাচক সংস্কারের সুযোগগুলিকে কাজে লাগিয়েই স্বশাসনের ক্ষেত্রে সরব হলেন জাতীয় নেতৃবর্গ।

১.৪.৬ ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন

১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে একাধারে সংসদীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ভিত্তিতে ভারতশাসনের নীতি গ্রহণ করা হলেও, প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন বা স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব ছিল না। ভারতে জাতীয় কংগ্রেসের সংস্কারপন্থী ও প্রগতিশীল নেতারা প্রস্তাবিত ব্রিটিশ শাসন-সংস্কারে আস্থা না দেখালেও এটা বুঝেছিলেন যে গণতন্ত্রের প্রত্যাশা পূরণ না হলেও, স্বশাসনের উপযোগী না হলেও সংসদীয় ও দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থার কিছু উপাদান এই আইনে ছিল। এই আইন অনুসারেই কংগ্রেস প্রাদেশিক নির্বাচনে অংশ নেয়, সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়, প্রদেশে সরকার গঠন করে, প্রশাসনিক ও পার্লামেন্টীয় শাসনে অভিজ্ঞতা লাভ করে। এই আইনকে সামনে রেখেই সীমিতভাবে হলেও সরকারের উন্নয়নমূলক কাজকর্মে কংগ্রেসসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেয়। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন সাম্রাজ্য শাসনের স্বার্থে ব্যবহৃত হলেও স্বশাসনের সাময়িক ও আংশিক সুযোগ সৃষ্টি করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ম মেনে প্রদেশগুলির শাসন সম্ভব ছিল না ঠিকই, ক্ষমতা বণ্টন পদ্ধতি বা মন্ত্রিদের দায়িত্ব কোন ক্ষেত্রেই গণতন্ত্রের নীতিপূর্ণ প্রতিফলিত হয় নি একথাও সত্য, তবে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনে যে সুযোগ ছিল সেটিই ভবিষ্যৎ ভারতের স্ব-শাসনের আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছে। ১৯৩৫ সালের শাসন-সংস্কারের পরবর্তী বছরের ঘটনাক্রম প্রমাণ করে যে ভারতে সাংবিধানিক ও সংসদীয় শাসনের ইতিবাচক সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে চলেছে। সংস্কারের প্রশ্নে মতবিরোধ, সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি,

সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা দায়িত্বশীল সাংবিধানিক শাসনের পথে বাধা হলেও গণতান্ত্রিক সংস্কার ও স্বশাসনের চাপের কাছে ব্রিটিশ শাসককে শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে হয়েছে। ক্রীপস মিশন, ওয়াভেল পরিকল্পনা ও ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা গণপরিষদ ও স্বাধীন সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে এক-একটি পদক্ষেপ হিসাবেই চিহ্নিত।

১.৪.৭ ক্রিপ্‌স্ মিশন

গণপরিষদের দাবিকে প্রস্তাবাকারে রূপ দেবার সরকারি প্রচেষ্টা সর্বপ্রথম লক্ষ্য করা গেল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের ক্যাবিনেট মন্ত্রী স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের শাসনসংস্কার সংক্রান্ত একদফা প্রস্তাবে। যুদ্ধ ও রাজনৈতিক অচলাবস্থার পটভূমিতে ১৯৪০ সালের ২৯ মার্চ ক্রিপস যে প্রস্তাব পেশ করেন শাসন-সংস্কারের ক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই পালাবদলের এক সূচনা বলা যেতে পারে। সংবিধান ও গণপরিষদ সম্পর্কে এতটা স্পষ্টভাবে সরকারের তরফ থেকে বক্তব্য ইতিপূর্বে পাওয়া যায় নি। ক্রিপস জানালেন—

১। যুদ্ধ শেষ হবার পরেই ভারতকে শাসনাধিকার দেওয়া হবে, এক নির্বাচিত সংস্থার মাধ্যমে ভারতের সংবিধান প্রণয়ন করা হবে। সংবিধানে ভারত ডোমিনিয়ন মর্যাদা পাবে।

২। নব নির্বাচিত প্রাদেশিক আইন পরিষদ গণপরিষদ নির্বাচিত করবে।

৩। গণপরিষদে ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্য উভয়ের প্রতিনিধি থাকবে।

৪। ব্রিটিশ ভারতের যে কোন অংশ এই ব্যবস্থার বাইরে থাকতে পারে বা পরে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

৫। যেসব প্রদেশ সংবিধান গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক তারা তাদের নিজস্ব সংবিধান প্রণয়ন ও গ্রহণ করতে পারে।

ক্রিপস প্রস্তাব নিয়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের মধ্যে ঐক্যমত হয়নি। মুসলিম লিগ স্বতন্ত্র পাকিস্থান রাষ্ট্র ও পৃথক গণপরিষদের দাবি করে। পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি না থাকাতে কংগ্রেসও প্রস্তাব সম্পর্কে সন্তুষ্ট ছিল না। গান্ধীজি প্রস্তাবটিকে ফেল পড়া ব্যাংকের আগাম চেক (A post-dated cheque on a crashing bank) বলে মনে করেছেন। আম্বেদকার প্রস্তাবটির মধ্যে বর্ণ হিন্দুদের আধিপত্যের সম্ভাবনা দেখেছেন। ভারতীয় প্রতিনিধিদের ও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মতান্তর ক্রিপস প্রস্তাব ও দৌত্যকে শেষ পর্যন্ত সফল হতে দেয়নি। সরকার বিষয়টির সন্তোষজনক মীমাংসার জন্য লর্ড ওয়াভেলকে (Lord Wavell) ভাইসরয় করে পাঠালেন। হরিজন পত্রিকায় গান্ধীজির 'ভারত ছাড়' (Quit India) পরিকল্পনা ব্যক্ত করে গান্ধীজি ইতিমধ্যেই এদেশে ব্রিটিশ শাসনের উপযোগিতা নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন। ভারতে ব্রিটিশ সরকারের উপস্থিতি যে জাপানী আগমনের কারণ হবে, ভারতের স্বার্থেই যে ব্রিটেনের ভারত ত্যাগ বাঞ্ছনীয় গান্ধীজি সে কথা জানালেন। কংগ্রেস কার্যকরী কমিটিতেও গ্রহণ করা হল ভারত ছাড় আন্দোলনের প্রস্তাব ও শেষ লড়াইয়ের বলিষ্ঠ

অঙ্গীকার। যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে বৈপ্লবিক গণ-আন্দোলনের বিস্ফোরণ ঠেকাতেই ব্রিটিশ সরকার এক রকম বাধ্য হল ওয়াভেল পরিকল্পনার মাধ্যমে নতুন রাজনৈতিক সমাধানের প্রস্তাব পেশ করতে।

১.৪.৮ ওয়াভেল পরিকল্পনা

ওয়াভেল পরিকল্পনায় (১৪ জুন, ১৯৪৫) শাসন-সংস্কারের প্রশ্নে আগেকার দীর্ঘসূত্রিতার অবসন ঘটানোর চেষ্টা হল। বলা হল নতুন সংবিধান রচনা না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয় নেতৃবর্গকে নিয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার (Interim Government) গঠিত হবে। কাউন্সিল তথা পরিষদে বড়লাট ও প্রধান সেনাপতি ছাড়া সবাই হবেন ভারতীয় প্রতিনিধি। হিন্দু ও মুসলমানদের সমপ্রতিনিধিত্ব থাকবে। কাউন্সিল চলবে ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন অঅইন মেনেই। এই সব পরিকল্পনাকে কার্যকর করার জন্য ঐক্যমতে আসার জন্য সিমলায় একটি বৈঠক আহ্বান করা হলেও, প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে কংগ্রেস ও লিগের মধ্যে ঐক্য হল না। ওয়াভেল দেশে ফিরে গিয়ে জানালেন (১৯ সেপ্টেম্বর) আগামী শীতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন হবে। যতশীঘ্র সম্ভব সংবিধান রচনার জন্য গণপরিষদ গঠিত হবে। গণপরিষদের গঠন বিষয়ে আলোচনা ও বিকল্প প্রস্তাব থাকলে তার ওপর আলোচনা হবে। ভারতীয়দের কাছে গ্রহণযোগ্য শাসন পরিষদ গঠিত হবে।

ওয়াভেল প্রস্তাব নিয়ে বিতর্ক চলতে থাকে। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক পরিস্থিতিও আরও সংকটজনক হয়ে ওঠে। আজাদ হিন্দ বাহিনীর সমর্থনে বিক্ষোভ, নৌবিদ্রোহ, বায়ুসেনার অসন্তোষ এবং শ্রমিক ধর্মঘট রাজনৈতিক অস্থিরতাকে ঘনীভূত করে। ১৯৪৫ সালে ক্ষমতায় এসে শ্রমিক দলের সরদার শাসন-সংস্কার ও ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার জ্য তিন সদস্যের ক্যাবিনেট মিশন ভারতে পাঠায়। ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় (১৬ মে, ১৯৪৬) গণপরিষদ সম্পর্কে একটি স্থির প্রস্তাব পেশ করা হল।

১.৪.৯ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা

গণবিক্ষোভ, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, ১৯৪৫ সালের নির্বাচন, নির্বাচনী রাজনীতিতে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের সাফল্য, গণপরিষদ সম্পর্কে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মত পাথক্য—সমস্ত বিষয় গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে ক্যাবিনেট মিশন যে পরিকল্পনা পেশ করে তার মূল সুপারিশগুলি ছিল ঃ

প্রান্তলিপি ঃ তিন সদস্যের ক্যাবিনেট মিশনে ছিলেন লর্ড পেথিক লরেন্স (Lord Pethick Lawrence), সার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ (Sir Stafford Cripps) ও এ. ভি. আলেকজান্ডার (A. V. Alexander)। কংগ্রেস, মুসলিম লিগ ও অন্যান্য দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতেই ক্যাবিনেট মিশন গণপরিষদ সম্পর্কে পরিকল্পনা পেশ করে।

১। গণপরিষদের মাধ্যমেই এদেশের সংবিধান রচিত হবে;

২। গণপরিষদের সদস্যরা প্রাদেশিক বিধানসভায় নিজ নিজ স্প্রদায় কর্তৃক নির্বাচিত হবেন;

৩। প্রতিনিধি নির্বাচনের পদ্ধতি হল একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ;

৪। চিফ কমিশনারের প্রতিনিধি হিসাবে কেন্দ্রীয় আইনসভায় দিল্লীর প্রতিনিধি, আজমীঢ় মারওয়াড়ের প্রতিনিধি ও কুর্গ লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের প্রতিনিধি থাকবেন ;

৫। গণপরিষদে রাজন্য ভারতের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব থাকবে (সংখ্যা অনধিক ৯৩)। আলোচনার মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচনের পদ্ধতি স্থির হবে ;

৬। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যতশীঘ্র সম্ভব নয়াদিল্লিতে মিলিত হবেন ;

৭। রাজ্যের প্রতিনিধি হিসাবে একটি আলোচনা কমিটি প্রথমে কাজ করবে ;

৮। প্রাথমিক অধিবেশনে সাধারণ কার্যবিধি স্থির হবে ;

৯। আদিবাসী ও বহির্ভূত অঞ্চলগুলি সম্পর্কে উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হবে ;

১০। প্রদেশের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে (ক, খ, গ) বিভাগের অন্তর্গত প্রদেশের সংবিধান রচনার কাজ শুরু করবেন। বিভাগের অন্তর্গত প্রদেশগুলি হল .

(ক) মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা ;

(খ) পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সিন্ধু ;

(গ) বাংলা, আসাম।

ইউনিয়ন সংবিধান রচনার কাজে বিভিন্ন বিভাগের প্রদেশগুলি ও রাজন্য ভারতের প্রতিনিধিরা আবার মিলিত হবেন।

১১। সংবিধান চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে কোন প্রদেশ ইচ্ছা করলে যে বিভাগে তার স্থান হয়েছে সেই বিভাগ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারে।

১২। আশু ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে সব দলের প্রতিনিধি নিয়ে এক 'অন্তর্বর্তী সরকার' (Interim Government) গঠিত হবে। এই সরকার ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগিতা পাবে। কেন্দ্রীয় সরকারের সব দপ্তর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে ভারতীয়দের হাতে হস্তান্তরিত হবে।

১.৪.১০ গণপরিষদের নির্বাচন

১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবমতই গণপরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। প্রদেশগুলির ২৯২ জন ও চীফ কমিশনার শাসিত ৪টি প্রদেশের (দিল্লী, আজমীঢ়, মাড়ওয়াড়, কুর্গ, ব্রিটিশ বালুচিস্থান) ২ জন প্রতিনিধির জন্য নির্বাচন হল। দিল্লি ও আজমীঢ়-মাড়ওয়াড় থেকে কেন্দ্রীয় আইনসভায় যে দুজন প্রতিনিধি ছিলেন তাঁরা গণপরিষদে ঐ অঞ্চলের প্রতিনিধি হিসাবে গৃহীত হন। প্রদেশগুলির ২৯২টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ২০৮, মুসলিম লিগ ৭৩ ও অন্যান্য দল বাকি ১১টি আসন লাভ করে।

ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনামত গণপরিষদের নির্বাচন হলেও নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি চরম রাজনৈতিক অচলাবস্থা সৃষ্টি করে। ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনামত সংবিধান রচনার ব্যাপারে পরিষদের প্রথম সভা ডাকা হল। মুসলিম লিগের নির্বাচিত সদস্যরা সভা বয়কট করলেন, গ্রুপ বা বিভাগ গঠনের প্রস্তাবে কংগ্রেস অসন্তুষ্ট ছিল। দ্বিধা সত্ত্বেও অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেবার ব্যাপারে মুসলিম লিগ রাজী হয়। কংগ্রেস প্রাথমিকভাবে অন্তবর্তী সরকারে যোগ দেবার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। গণপরিষদে স্বাধীনভাবে কাজ করতে না পারলে কংগ্রেস পরিষদ ত্যাগ করবে—নেহেরুর এই বিবৃতি কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের পুরনো বিতর্ক ও কলহে নতুন মাত্রা যোগ করে। মুসলিম লিগ নেহেরুর নেতৃত্বে অন্তবর্তীকালীর সরকারে যোগ দিতে অস্বীকার করে। ওয়াভেলের অনুরোধ উপেক্ষা করে মুসলিম লিগ ১৬ আগস্ট প্রতিবাদ দিবস পালন করে। লিগ-কংগ্রেস কলহ, মিটিং-মিছিল। দাঙ্গা মিলিহেয় রাজনৈতিক অচলাবস্থা চরমে ওঠে। ভারত ভাগ, পাকিস্থান রাষ্ট্রের দাবি, পৃথক গণপরিষদ গঠন, প্রায় প্রতিটি প্রশ্নে লিগের অবস্থান নিয়ে কংগ্রেস অসন্তুষ্ট ছিল। প্রতিবাদ দিবস পালন ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কৌশল কংগ্রেস ও লিগের মধ্যে বিভেদ রেখা আরও স্পষ্ট করে দেয়। এসব সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত অয়াবেলের আহ্বানে মুসলিম লিগ মন্ত্রীসভায় যোগ দেন। সরকারের যোগ দেবার পর দপ্তর বন্টন, বাজেটে কর ধার্যের প্রস্তাব (অর্থমন্ত্রী লিয়াকত আলী এই প্রস্তাব আনেন) এসব নিয়ে কংগ্রেস ও লিগের বিরোধী অবস্থান আরও বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেল। হরতাল, সভা,মিছিল, দাঙ্গা (কলকাতা ও নোয়াখালি ট্যাজেডি) নিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্ব বিক্ষুব্ধ ছিল। মুসলিম লিগের পাকিস্থান দাবি ও প্ররোচনামূলক কার্যপলাপে (পাঞ্জাব, লাহোর, মুলতান, গুজরাট, জলন্ধন—সর্বত্রই বিশৃঙ্খলা চরমে পৌঁছেছে) কংগ্রেস বিবতর হয়েছে এবং গণপরিষদে মুসলিম লিগের অংশগ্রহণের যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই পর্যায়ে ওয়াভেল যখন দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, বিকল্পের সন্ধান করছেন, ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার সঠিক রূপ দেবার কথা ভাবছেন, ঠিক তখনই তাঁকে ফিরে যেতে হল। ওয়াভেলের জায়াগয় ভারতে বড়লাট হিসাবে এলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন (Lord Mountbatten)ঙ্গ ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭ মাঠন্টব্যাটেন ভারতে এলেন এবং এর কয়েকদিন পরেই তাঁর হাতে পৌঁছল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলির (Attlee) ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের খসড়া ঘোষণা।

১.৪.১১ দেশবিভাগ, মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ও গণপরিষদ

১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি সংসদে অ্যাটলি ঘোষরা করলেন—

১। কোনরকম বিলম্ব না করে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে দায়িত্বশীল ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে।

২। ইতিমধ্যে যদি দেকা যায় ক্যবিনেট মিশন পরিকল্পনামত প্রতিনিধিমূলক গণপরিষদ রচিত সংবিধান সর্বসমমতভাবে গৃহীত হচ্ছে না, তবে ব্রিটিশ সরকার স্থির করবে নির্দিষ্ট সময়ে কার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে।

৩। ক্ষমতা হস্তান্তরের আগেই দেশীয় রাজ্যগুলির ওপর রাজশক্তির সর্বময় ক্ষমতার অবসান হবে।

৪। ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে উদ্ভুত বিষয় নিয়ে ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন দলগুলির সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদন করবে।

৫। ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হবে না।

২৪ মার্চ, ১৯৪৭ বড়লাট কার্যভার গ্রহণ করেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের প্রবল মতপার্থক্য, গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, পাকিস্তান দাবি নিয়ে মুসলিম লিগের অনমনীয় অবস্থান—সবকিছু লক্ষ্য করে ভাতরবিভাজন, ক্ষমতা হস্তান্তর ও গণপরিষদ সম্পর্কে লর্ড মাউন্টব্যাটেন একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা পেশ করলেন। মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা নানা বাধার মধ্যে পেশ হল ও ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদন পেল ২ জুন, ১৯৪৭। ৩ জুন, ১৯৪৭ প্রস্তাবটি ব্রিটিশ সংসদে ঘোষিত হল। মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুসারে ঃ (১) ভারত ও পাকিস্তান পৃথক ডোমিনিয়নের মর্যাদা পেল। (২) উভয় দেশের জন্য পৃথক গণপরিষদের অধিকার স্বীকৃতি পেল। গণপরিষদ সম্পর্কে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনায় বলা হল ঃ

(ক) যেসব অঞ্চল বর্তমান গণপরিষদে যোগ দিতে অনিচ্ছুক তাদের ওপর গণপরিষদ রচিত সংবিধান চাপিয়ে দেওয়া হবে না।

(খ) বাংলা ও পাঞ্জাবের মুসলমান-প্রধান ও অমুসলমানপ্রধন জেলাগুলি পৃথকভাবে বৈঠকে বসবে এবং সাধারণ ভোটে স্থির করবে প্রদেশের বিভাজন হবে কিনা। বিভাজনের প্রস্তাব হলে প্রত্যেক অশই ঠিক করবে তারা বর্তমান গণপরিষদে থাকবে বা নতুন গণপরিষদ গঠন করবে ও তাতে যোগ দেবে।

(গ) বাংলা ও পাঞ্জাবের সীমানা নির্ধরারণ করবে দুটি পৃথক সীমানা কমিশন।

(ঘ) সিন্ধু প্রদেশের আইনসভা স্থির করবে এই প্রদেশ বর্তমান বা নবগঠিত গণপরিষদে যোগ দেবে।

(ঙ) আসামের মুসলমান-প্রধান শ্রীহট্ট জেলা গণভোটের মাধ্যমে স্থির করবে ওই জেলা আসামের সঙ্গে থাকবে না পূর্ববঙ্গের (পূর্ব পাকিস্থান) সঙ্গে যুক্ত হবে।

(চ) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ গণভোটের মাধ্যমে স্থির করবে বারত অথবা পাকিস্তান কার সঙ্গে যুক্ত হবে।

(ছ) বালুচিস্তান নিজেই স্রি করবে ভারতের সঙ্গে থাকবে কিনা।

(জ) দেশীয় রাজ্যগুলির ডোমিনিয়নে যোগ দেবার অধিকার থাকবে।

এই প্রস্তাবগুলিকে কার্যকর করার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যতশীঘ্র সম্ভব আইন প্রণয়ন করবে।

১.৪.১২ ভারতের স্বাধীনতা আইন ও গণপরিষদ

মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনাকে আইনে রূপদান করা হল অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে। ১৯৪৭ সালের ৪ জুলাই প্রধান মন্ত্রী অ্যাটলি স্বাধীনতা বিল (Indian Independence Bill) কমন্স সভায় পেশ করলেন।

১৮ জুলাই রাজা ষষ্ঠ জর্জের স্বাক্ষর পাবার পর বিলটি আইনে পরিণত হল। ভারতে এই আইন রূপ পেল ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে। ১৫ আগস্ট এই আইন কার্যকর হল (The Indian Independence Act, 1947)। এই আনিবলে ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালের পর নবগঠিত ডোমিনিয়নের ওপর রাজশক্তির আর কোন ক্ষমতা থাকবে না। লর্ড অ্যাটলির ভাষায় সম্পন্ন হল ব্রিটেনের দৌত্য। লর্ড স্যামুয়েলের কথায় রচিত হল 'a unique event in history—a treaty of peace without war'। ১৯ জুলাই ভারত ও পাকিস্তানের অস্থায়ী সরকার ঘোষিত হল। পার্টিশন কাউন্সিল, কাউন্সিলের স্টিয়ারিং কমিটি, সালিশী ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদির তদারকিতে বিভাজন সম্পন্ন হল। সংবিধান রচনার কাজে স্বতন্ত্রভাবে অগ্রসর হল দুটি পৃথক গণপরিষদ। ডোমিনিয়ন ভারতে ভারতীয় জনগণের পক্ষে নতুন সংবিধান রচনার দায়িত্ব নেয় ভারতের গণপরিষদ। গণপরিষদের হাতে ডোমিনিয়নের আইনসভার দায়িত্ব অর্পণ করা হল। ভারত ব্যবচ্ছেদ হলেও স্বাধীন ভারতের সংবিধানগত ও রাজনৈতিক পুর্গঠনের কাজ শুরু হল গণপরিষদের নেতৃত্বে।

১.৫ গণপরিষদের প্রশ্নে মুসলিম লিগ

গণপরিষদ সম্পর্কে মুসলিম লিগের প্রাথমিক অবস্থান ছিল দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব জড়িত। ক্রমশ এ বিষয়ে লিগের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়। নির্বাচনে অংশ নেওয়া, নির্বাচনী ফলাফল, যুক্তফ্রন্ট গঠন প্রায় সব প্রশ্নে কংগ্রেস ও লিগের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। গণপরিষদে কংগ্রেস আধিপত্য নিয়ে লিগ কখনই সন্তুষ্ট ছিল না। হিন্দু সংগঠনে ও কংগ্রেসের নেতৃত্বে সংবিধানে মুসলিমদের অধিকার ন্যায্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে—এ বিশ্বাস জিন্নার নেতত্বে মুসলিম লিগের ছিল না। সুতরাং ক্রিপস মিশন, ক্যামিনেট মিশন বা ওয়াভেল পরিকল্পনায় মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের প্রশ্নে বা অন্যান্য প্রশ্নে মুসলিম লিগ সন্ধিগ্ধ দৃষ্টি নিয়েই অগ্রসর হয়েছে, মুসলিম লিগের লক্ষ্ণৌ অধিবেশন (১৯৩৭) থেকেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দৃষ্টি নিয়ে মুসলিম লিগ পরিচালিত হয়েছে। কংগ্রেসের পূর্ণস্বরাজ তত্ত্ব বা স্বশানের গণতান্ত্রিক ভাবনায় তাদের আস্থা ছিল না। ১৯৩৭-৩৯ বছরগুলিতে লিগ সন্দেহ নিয়েই কংগ্রেসের সঙ্গে একই মঞ্চে অগ্রসর হলেও ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রয়োজনের কতা বলে পরিস্থিতিকে আরও উত্তেজিত করেছে। যুদ্ধের পরিস্থিতিতে মুসলিম স্বার্থরক্ষার বিষয়ে মুসলিম লিগের দাবি আরও জোরদার হয়েছে, গণপরিষদ সম্পর্কে কংগ্রেসের উৎসাহ ও আবেগ বা ঐক্যবদ্ধ ভারত রাষ্ট্রের সংবিধান বিষয়ে গংগ্রোসের ভাবনাকে মুসলিম সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেছে। ত্রিপুরী কংগ্রোসের (১৯৩৯) পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাব ও গান্ধীজীর রাজনৈতিক নিষ্পত্তির ভাবনার প্রতিবাদই ধ্বনিত হয় জিন্নার লাহোর দাবি ও পাকিস্তার রাষ্ট্রের দাবির মধ্যে। কংগ্রেসের দাবির প্রতিবাদ হিসাবেই মুসলিম লিগের প্রচার ছিল দ্বি-জাতি তত্ত্বের। এই মাতৃভূমিতে এমন সংবিধান হবে যেকানে দুটি সম্প্রদায়ের শাসনাধিকারের দাবি স্বীকৃত হবে, এটাই ছিল মুসলিম লিগের দৃঢ়বিশ্বাস। ওয়াভেলের প্রস্তাবে ভারত বিঝারনজের কথা না থাকলেও ক্যাবিনেট মিশন, বা মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা মুসলিম লিগের দাবিমতই

বারতবিভাজন ও স্বতন্ত্র গণপরিষদ গঠনের দাবিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। গণপরিষদের নির্বাচনে প্রত্যাশিত সাফল্য পেয়েও মুসলিম লিগের নির্বাচিত সদস্যরা গণপরিষদের প্রথম সভা বয়কট করেছে। সম্ভবত গণপরিষদে কংগ্রেস আধিপত্য এবং মুসলিম প্রতিনিধিত্বের ও অধিকারের প্রশ্নেই লিগের এই সিদ্ধান্ত। পৃথক পাকিস্তান রাষ্ট্র ও পৃথক গণপরিষদেই তাদের স্বাধীনতা সুরক্ষিত থাকবে এই দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত হয়েই তারা গণপরিষদের সভা বয়কট করেছে। গণপরিষদে গ্রুপ নিয়ে কংগ্রেসের দাবি বা গণপরিষদের শর্ত নিয়ে কংগ্রেসের ভাবনা লিগের কাছে কখনই গ্রহণযোগ্য হয়নি।স প্রতিনিধিমূলক দায়িত্বশীল সরকার গঠনের প্রশ্নে কংগ্রেসের সঙ্গে লিগের সম্পর্ক ছিল সংঘাতমূলক এবং ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল আপোষমূলক।

১.৬ গণপরিষদে দেশীয় রাজ্যের অংশগ্রহণের প্রশ্ন

গণপরিষদে দেশীয় রাজ্যের অবস্থান স্পর্কে ক্রীপস্ প্রস্তাবে বলা হয়েছে, গণপরিষদে দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি থাকবে। রাজন্যবর্গের সঙ্গে গণপরিষদে যোগদানের ব্যাপারে আলোচনার জন্য লর্ড ওয়াভেন প্রস্তাব দেন। ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্য উভয়েই সমস্ত ভারতের ইউনিয়নের অংশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ইউনিয়নের আইনসভা ও শাসন পরিষদে রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিত্বের কথাও ক্যাবিনেট মিশন বলেছে। রাজন্যবর্গের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব, সংবিধান রচনায় তাদের পরামর্শ গ্রহণের কথাও বলা হয়েছে। ক্ষমতা হস্তান্তর হলেও রাজ্যবর্গের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হবে না। অ্যাটলির ঘোষনায় ওই কথা স্পষ্টভাবেই ছিল। মাউন্টব্যাটেন ঘোষণায় দেশীয় রাজ্যগুলিকে গণপরিষদে যোগ দেবার ব্যাপারে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ দেশীয় রাজ্য (কাশ্মীর, জুনাগড়, হাদ্রাবাদ ছাড়া) ভারেতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, যোগাযোগের ক্ষেত্রে স্বশ)াসনর অধিকারও পায়। স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার প্রস্তাবে দেশীয় রাজাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হবে না—ব্রিটিশ আইনগত ও শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাবগুলিতে সে কথা স্বীকার করা হয়েছে। দেশীয় রাজাদের স্থানীয় অবস্থান নিয়ে বিতর্ক থাকলেও কংগ্রেস, মুসলিম লিগ বা অন্যান্য দল ওদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হবে না বলেই মেনে নিয়েছে। তবে ১৫ আগস্টের পর রাজন্যবর্গের পৃথক আন্তর্জাতিক অবস্থান থাকতে পারে বলে ভারতের স্বাধীনতা আইনে বলা হয়েছে। রাজন্যবর্গকে ভারত রাষ্ট্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ও গণপরিষদে ওদের সুষ্ঠু প্রতিনিধিত্বের জন্য গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন থেকে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছে।

১.৭ গণপরিষদের গঠনপ্রণালী

গণপরিষদের গঠনপ্রণালী সম্পর্কে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার মূল ধারণাগুলিই প্রযোজ্য হয়েঝে। ক্যবিনেট মিশন পরিকল্পনায় গণপরিষদ কিভাবে নির্বাচিত হবে, গণপরিষদের নির্বাচনের পদ্ধতি কী, প্রতিনিধিত্বের

ভিত্তি কী, অধিবেশন, উপদেষ্টা কমিটি, প্রদেশের প্রতিনিধিত্বের বিভাগ কেমন হবে এসম বিষয়ে প্রস্তাব আছে (ক্যাবিনে মিশন পরিকল্পনার সুপারিশগুলি দ্রষ্টব্য)। বর্তমান আলোচনায় আমরাগণপরিষদের সদস্যসংখ্যা, সদস্যবন্টনের পদ্ধতি, গণপরিষদের নেতৃত্ব, প্রনিধিত্বের ও আসনবন্টনের নীতি, অধিবেশন, কমিটি ব্যবস্থা এইসব বৈশিষ্ট্যগুলির ওপর আলোকপাত করবো।

১.৭.১ গণপরিষদের প্রতিনিধিত্ব ও আসন বন্টনের নীতি ও সদস্যসংখ্যা

গণপরিষদের প্রতিনিধিত্ব ও আসন বন্টনের নীতি স্থির হয়েছিল ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায়। ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা অনুসারে ঃ

১। ব্রিটশ শাসিত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলি জনসংখ্যার অনুপাতে গণপরিষদে আসন পাবে। প্রত্যেক প্রদেশ থেকে প্রতি দশলক্ষ জনসংখ্যার জন্য একজন করে প্রনিধি গণপরিষদে স্থান পাবেন।

২। গণপরিষদের সব আসন সাধারণ, মুসলমান ও শিখ—এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে আনুপাতিক হারে বন্টিত হবে।

৩। প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যরা একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নির্বান করবেন।

৪। দেশীয় রাজ্যগুলির প্রনিধি মনোনয়নের পদ্ধতি স্থির হবে ঐ রাজ্যগুলির শাসনদের সঙ্গে গণপরিষদের আলোচনার ভিত্তিতে। দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধির সংখ্যা স্থির হয় ৯৩।

ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবমত অবিভক্ত ভারেতের গণপরিষদের প্রতিনিধিসংখ্যা ছিল এইরকম ঃ

মোট সদস্য — ৩৮৯	
প্রদেশগুলির সদস্য—	
(ক) সাধারণ	২১০
(খ) মুসলিম	৭৮
(গ) শিখ	৪
চিফ কমিশনার শাসিত প্রদেশগুলির সদস্য	৪
দেশীয় রাজ্যগুলির সদস্য	৯৩

১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে গণপরিষদের যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে প্রদেশগুলির ২৯২টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ২০৮, মুসলিম লিক ৭৩ ও অন্যান্যদল ১১টি আসন পায়। চিফ কমিশনার শাসিত

৪টি প্রদেশের মধ্যে ২টি প্রদেশের প্রতিনিইদর জন্য নির্বাচন হয়। দিল্লি ও আজমীর মাড়ওয়ার থেকে কেন্দ্রীয় আইনসভার যে ২ জন প্রতিনিধি চিলেন তাঁরাই গণপরিষদের জন্য মনোনীত হন।

দেশবিভাগের পর স্বতন্ত্র ভারতীয় গণপরিষদের সদস্যসংখ্যা সর্বমোট ২৯৯। এঁদের মধ্যে ২২৯ জন প্রদেশগুলি থেকে এবং ৭০ জন দেশীয় রাজ্যগুলি থেকে গণপরিষদে স্থান পান। অবিভক্ত ভারতে গণপরিষদে কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা ছিল শতকরা ৬৯ জন। ভারত বিভাগের পর এই অনুপাত দাঁড়ায় শতকরা ৮২ জন। বারত বিভাগের পর মুসলিম লিগের ২৯ জন প্রতিনিধি এদেশে ছিলেন।

১.৭.২ গণপরিষদের নেতৃত্ব

গণপরিষদের সদস্য ও নেতৃবর্গের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চিলেন ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ (সভাপতি), জওহরলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটে, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, জগজীবন রম, জে. বি. কৃপালনী, পট্টভি সিতারামাইয়া, সি. রাজাগোপালচারী, মৌলানা আজাদের মত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। এঁদের অধিকাংশই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরের গুরুত্বপূর্ণ নেতা ও পদাধিকারী। গণপরিষদের সদস্যদের মধ্যে শুধু কংগ্রেসের প্রভাবশালী নতোরাই ছিলেন না, ছিলেন ড. বি. আর. আম্বেদকরের মতো আইনজ্ঞ ও হরিজন সদস্য, শাহদুল্লাহর মতো বিশিষ্ট মুসলমি নেতা, কে. আইয়ার, এন. জি. আয়েঙ্গার, এইচ. এন কুঞ্জরুর মতো অভিজ্ঞ আইনজ্ঞ ও সংবিধান উপদেষ্টা এবং রাজকুমারী অমৃতা কাউর ও সরোজিনী নাইডু-র মতো মহিলা ব্যক্তিত্ব। রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, চিকিৎসক, আইনজ্ঞ, লেখক, ইনসভার সদস্য, শিল্পপতি, প্রশাসন, সমাজসেবী—নানা বিশিষ্ট পেশা ও বৃত্তির মানুষের ভীড়ে গণপরিষদ ছিল এক জমজমাট সভা। গণপরিষদের নেতৃত্বের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল কংগ্রেসের একাধিপত্য। এমনও দেকা গেছে কংগ্রেসের সরকারি দলের নেতা, কংগ্রেস দলের নেতা এবং গণপরিষদের নেতা—এই তিনের মধ্যে কোন প্রভেদরেখা নেই। একই ব্যক্তি কংগ্রেস দল, সরকার আর গণপরিষদের মধ্যমণি হিসাবে বিরাজ করছেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরাই গণপরিষদের অধিকাংশ ও গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সভাপতি। আবার একই ব্যক্তি একাধিক কমিটিরও সদস্য। গণপরিষদের নেতৃত্ব বিষয়ে আরেকটি কৌতুহলপ্রদ দিক হল বিশিষ্ট ইনজ্ঞরাই পরিষদের চিন্তাভাবনা ও কাজকর্মকে প্রভাবিত করেছেন। অভিজ্ঞা আইনজ্ঞরাই পরিষদের বিতর্ক, নীতিনির্ধারণ এবং সিদ্দান্তগ্রহনের ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছেন। গণপরিষদের নেতৃত্ব প্রসঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য হল, এখানে কোন কমিউনিস্ট, সমাজতন্ত্রী বা সাধারণ মানুষের কোন প্রতিনিধি ছিলেন না। প্রতিনিধিদের সামাজিক প্রেক্ষাপট বা ভিত্তি সম্পর্কে বলা যায়, ওঁরা অধিকাংশই সমাজের উচ্চবর্গের মানুষ, বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত, শিল্প বা পুঁজির স্বার্থ বা রক্ষণশীল স্বার্থের প্রতিনিধি। নেতৃত্বের বিচারে গণপরিষদকে গণসংস্থা বলা যাবে না। গান্ধীজির মতো জননেতার গণপরিষদের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে সন্দেহ ছিল।

১.৭.৩ গণপরিষদের অধিবেশন ও কর্মপদ্ধতি

গণপরিষদ গঠননের পর প্রায় চারমাস পরেও এর কোন অধিবেশন বসে নি। সম্ভবত কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের মতো মতানৈক্যের কারণেই সভা বসতে বিলম্ব হয়েছে। ১৯৪৬ সালের ৯ ডিসেম্বর দিল্লির কনস্টিটিউশন হলে শেষ পর্যন্ত গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসল। ২০৭ জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভা শুরু হল। মুসলিম লিগ সদস্যরা সভা বয়কট মরলেন। কংগ্রেসের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য সচ্চিদানন্দ সিংহকে অস্থায়ী সভাপতি করেসবার কাজ শুরু হল। ১১ ডিসেম্বর ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ গণপরিষদের অস্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হলেন। ১২ ডিসেম্বর কার্যবিধি সংক্রান্ত কমিটি (Committee of Rules of Procedure) গঠিত হল। প্রথম অধিবেশনে কমিটি গঠনরে কাজই হয়েছে, সংবিধান সম্পর্কে কোন বিতর্ক বা প্রসাতব ছিল না। অবিভক্ত ভারতে মোট চারটি অধিবেশনে গণপরিষদ বসেছে। এইসময় পরিষদের কাজে তেমন গতি ছিল না। গণপরিষদের পঞ্চম অধিবেশনই ছিল ঐতিহাসিক। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মধ্যরাত্রে এই অধিবেশনে স্বাধীন ভারতের গণপরিষদ বসে। মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ও ভারতের স্বাধীনতা আইনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের গণপরিষদ সার্বভৌমিক ক্ষমতা পায়। পঞ্চম অধিবেশন থেকেই গণপরিষদের প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস ও সংবিধান রচনায় উদ্যাগ লক্ষ্য করা যায়। সংবিধান খসড়া কমিটি ড. আম্বেদকরের নেতৃত্বে সংবিধান রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন ২ সপ্তাহের বেশি চলে নি। কিছু প্রাথমিক কাজকর্ম ছাড়া অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই এই অধিবেশনে ওঠেনি। এমনকি সংবিধানের উদ্দেশ্য সংক্রান্ত প্রসাতব (Objective Resolution) এই অধিবেশনে আলোচিত হয় নি। ১৯৪৭ সালে জানুয়ারি মাসের ২০-২৩ তারিখে এ বিষয়ে আলোচনা হয়। এম. আর. জয়কার (M. R. Jaykar) প্রস্তাবটি পেশের পক্ষে ছিলেন না। কিন্তু নেহরুর দৃপ্ত ভাষণ শেষ পর্যন্ত সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দেয়। নেহরুর বক্তব্য ছিল 'পরিষদের প্রথম কাজ হল একটি নতুন সংবিধান এনে ভারতকে স্বাধীন করা, ভারতবাসীর অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করা এবং তারপর নিজের মতো করে প্রতিটি ভারতবাসীকে গড়ে উঠতে সাহায্য করা.....।' দ্বিতীয় অধিবেশনে গণপরিষদ কমিটি গঠনের কাজেই ব্যস্ত ছিল। তৃতীয় অধিবেশনে অবয্য ভবিষ্যৎ সংবিধানের একটি রূপরেকা উপস্থিত করা হয়েছে এবং বিভিন্ন বিষয়ে কতকগুলি প্রশ্ন পেশ করা হয়েছে এবং ১৯৪৭ সালের ১০ এপ্রিসের মধ্যে এইসব প্রশ্নের উত্তর কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য এবং গণপরিষদের সদস্যদের কাছে চাওয়া হয়েছে। দেশীয় রাজ্যের গণপরিষদে আসন বন্টনের প্রশ্নটিও এই পর্বে এসেছে। বিভিন্ন কমিটির বিরপোর্ট পেশ ছাড়া কোন আলোচনা এই পর্বে হয়নি। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে চতুর্থ অধিবেশনে দেশভাগের প্রেক্ষাপটে গণপরিষদের কাজকর্মে মানসিকতা পরিবর্তনের প্রকাশ লক্ষ্য করা গেল। কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সংবিধান কমিটির রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা শুরু হলেও সভা ৩১ জুলাই মুলতুবি হয়ে যায়। সন্দেহ নেই অবিভক্ত গণপরিষদে নয়, ভারতয় গণপরিষদেই সংবিধান রচনার প্রকৃত তোড়জোড় শুরু হয়। স্বাধীন ভারতের প্রতি সেবা ও কর্তব্যের প্রতিজ্ঞা নিয়ে শুরু হয় পঞ্চম

ঐতিহাসিক অধিবেশন। মাউন্টব্যাটের পর্ভনর জেনারেল হিসাবে এবং নেহরুর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার মধ্য দিয়ে স্বাধীন ভারতের যাত্রা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে আইনসভা ও সংবিধান সভা হিসাবে গণপরিষদের কাজ শুরু হয়। গণপরিষদের কাজ নিয়ে রিপোর্ট দেবার জন্য কমিটিও গঠিত হয়। ২৯ আগস্ট খসড়া সংবিধান কমিটি গঠন ও এর কাজকর্ম সম্পর্কে প্রস্তাব নেওয়া হয়।

১.৭.৪ গণপরিষদের কমিটি

গণপরিষদের কাজকর্ম প্রধানত পরিচালিত হহেয়েছে বিভিন্ন সময়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে। কনো সন্দেহ নেই ভারতের মতো এক বিরাট দেশে সংবিধান রচনার কাজ অত সহজে সম্পন্ন হবার নয়। সম্ভবত এই কারণেই সংবিধান খসড়া কমিটি সহ বিভিন্ন কমিটি গড়ে, কমিটির জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ সদস্যদের পরামর্শ নিয়ে সংবিধান রচনার কাজ শুরু হয়েছে। গণপরিষদের সচিবালয়ের (Secretariat) এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিক চিল। তথ্য সংগ্রহ, নথিপত্র পেশ, নধিপত্র করীক্ষা, ফাইল তৈরি ইত্যাদি কাজে সচিবালয়ের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। কমিটিগর্লির মধ্যে বিভিন্ন কাজ বন্টন করে দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল সংবিধান রচনার কাজে আরও বিশেষীকরণ ও সূক্ষ্মতা আনা, কাজে সমন্বয় সৃষ্টি করা এবং কাজে আরও গতি আনা। গণপরিষদের কমিটিগুলির একটি সামগ্রিক পরিচিতি এখানে দেওয়া হল ঃ

কমিটি	সদস্যসংখ্যা	সভাপতি
কার্যবিধি সংক্রান্ত কমিটি (Committee on the Rules of Procedure)	১৬	ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ
পরিচালনা কমিটি (Steering Committee)	১৪	ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ
জাতীয় পতাকা সংক্রান্ত অস্থায়ী কমিটি (Committee on National Flag)	১৩	ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ
অর্থ ও কর্মীবিষয়ক কমিটি (Finance and Staff Committee)	১৪	ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ
কেন্দ্রীয় সংবিধান কমিটি (Union Constitution Committee)	১৫	জওহরলাল নেহরু
প্রদেশ কমিটি (States Committee)	৬	জওহরলাল নেহরু

কমিটি	সদস্যসংখ্যা	সভাপতি
কেন্দ্রয় সংবিধান কমিটির অর্থ-বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কমিটি* (Expert Committee on the Financial Provisions of the Union Constitution Committee)	৩	এন. আর. সরকার *
সুপ্রীম কোর্ট বিষয়ে অস্থায়ী কমিটি (Adhoc Committee on Supreme Court)	৭	এস. ভরদাচারি *
ভাষাতত্ত্ব প্রদেশ কমিশন * (Linguistic Provinces Committee)	৩	এম. কে. ধর *
পরিচয় সংক্রান্ত কমিটি (Credentials Committee)	৭	আলাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার
সভা কমিটি (House Committee)	১৭	বি. পট্টভী সিতারামাইয়া
চিফ কমিশনারের প্রদেশ সংক্রান্ত কমিটি (Committee on Chief Commissioners' Provinces)	৭	বি. পট্টভী সিতারামাইয়া
কার্যক্রম নির্দেশ-বিষয়ক কমিটি (Order of the Business Committee)	৩	কে. এম. মুন্সী
গণপরিষদের কার্য-সংক্রান্ত কমিটি (Committee on the Functions of the Constituent Assembly)	৭	জি. ভি. মালালাঙ্কান
সংখ্যালঘু ও উপজাতির মৌলিক অধিকার এবং বহিরাগত অঞ্চল বিষয়ক পরামর্শদান কমিটি (Advisory Committee on Fundamental Rights of Minorities, Tribal and Excluded areas)	৭৯	বল্লভভাই প্যাটেল
প্রাদেশিক সংবিধান কমিটি (Provincial Constitution Committee)	২৫	বল্লভভাই প্যাটেল
সংবিধান খসড়া কমিটি (Drafting Committee)	৯	ডি. বি. আর. আম্বেদকর

উপসমিতিগুলির মধ্যে জে. বি. কৃপলনীর নেতৃত্বে মৌলিক অধিকর সংক্রান্ত কমিটি (১২), গোপীনাথ বলদোলুইয়ের নেতৃত্বে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত, আসাম এবং বহিরাগত ও আংশিক বহিরাগত অঞ্চল কমিটি (৫) *, এ. ভি. ঠাকুরের নেতৃত্বে বহিরাগত ও আংশিক বহিরাগত (আসাম বাদে) অঞ্চল কমিটি, (৭) এবং এইচ. সি. মুখার্জীর নেতৃত্বে সংখ্যালঘু কমিটি (৩৫)* বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

প্রসঙ্গত সংবিধানের খসড়া কমিটি (Drafting Committee) সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। ড. আম্বেদকরের নেতৃত্বে ওই কমিটির সদস্যরা চিলেন আলাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার, এন. গোপালস্বামী আয়েঙ্গার, কে. এম. মুন্সী, মহম্মদ শাহদুল্লা, বি. এল. মিটার ও ডি. পি. খৈতান। পরবর্তীকালে বি. এল. মিটারের স্থলাভিষিক্ত হল এন. মাধব রাও এবং প্রয়াত ডি. পি. খৈতানের শূন্যস্থান পূরণ করেন টি. টি. কৃষ্ণমাচারী। গণপরিষদের সিদ্ধান্তমত সংবিধানের খসড়া প্রস্তাব পরীক্ষা ও সংবিধানকে রূপদান করাই ছিল খসড়া কমিটির কাজ। প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনের কাজেও এর ভূমিকা ছিল।

১.৮. গণপরিষদের কার্যাবলী

গণপরিষদের গঠন ও কার্যপদ্ধতির উপর বিস্তৃত আলোচনার পর আসুন আমরা দেখি গণপরিষদের কাজ বা ভূমিকাটি কী! একটি আইনসভা যেভাবে কাজকর্ম করে বা কাজকর্মের যে পদ্ধতি অনুসরণ করে গণপরিষদে সেই সব পদ্ধতিই গ্রহণ করা হয়েছে। সভাপতি নির্বাচন দিয়ে শুরু কের, সবা পরিচালনার নিয়মনীতি, নির্ধারণ করে, বিভিন্ন কমিটি গঠনক রেএকটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গণপরিষদের কাজকর্ম চলেছে। গণপরিষদ প্রাথমিকভাবে তার কাজ শুরু করেছে আলোচনার বা বিতর্কের এক মঞ্চ হিসাবে। পরবর্তী সমসয় এই কাজটিই আইনসভার কাজ হিসাবে রূপ নেয়। এই অর্থে গণপরিষদ হল সংবিধান সভাঙ্গ ভারতের সবিধান রূপ লাভ করেছে গণপরিষদেরই উদ্যোগ ও দীর্ঘ অধ্যবসায়ের মূল্যে।

১.৮.১ আলোচনা বঞ্চ হিসাবে গণপরিষদ

আলোচনার ও বিতর্কের মঞ্চ (Public Forum) হিসাবে গণপরিষদের প্রধান ভূমিকা ছিল সংবিধান রচনার প্রশ্নে বির্তক করা এবং সংবিধান রচনার কাজ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। গণপরিষদের ভিতরে ও বাইরে সংবিধান রচনার কাজ কিভাবে চলবে, এক্ষেত্রে কাদের নেতৃত্বে থাকবে, পরিষদের এক্তিয়ার কি হবে নানা প্রশ্নেই কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের মধ্যে আলোচনা ও দর কষাকষি চলেছে। অবিভক্ত ভারতে গণপরিষদের প্রথম চারটি অধিবেশনে সংবিধান রচনার প্রশ্ন ততটা গুরুত্ব পায়নি যতটা পেয়েছে গণপরিষদের কাজকর্ম পরিচালনা, বিভিন্ন স্তরে সমন্বয় ও ভারসাম্য রক্ষা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে দায়িত্ব বন্টন ইত্যাদি প্রশ্ন। বিভিন্ন কমিটি নির্বাচন করে, এই কমিটিগুলির হাতে বিভিন্ন সমস্যা বিচারের দায়িত্ব দিয়েই প্রাথমিকভাবে কাজ চলেছে

* তারকা চিহ্ন কমিটিগুলির সভাপতি বা সদস্যরা গণপরিষদের সদস্য নন। গণপরিষদের বাইরে অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে এঁরা মনোনীত হয়েছিলো।

গণপরিষদের। কার্যনির্বাহী কমিটি, পরিচয় সংক্রান্ত কমিটি, কর্ম নির্দেশক কমিটি ও কতকগুলি স্থায়ী কমিটি গঠন করেই প্রথম দিকে গণপরিষদ অগ্রসর হয়েছে। কমিটিগুলির প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সংবিধান রচনার প্রসঙ্গ গুরুত্ব পেয়েছে বারত বিভজনের পর ও ভারতের জন্য পৃথক গণপরিষদ সৃষ্টির পর। সংবিধান রচনার প্রস্তুতি কর্ম প্রকৃতপক্ষে শুরু হয় ১৯৪৭ সালের পরবর্তীকালে পঞ্চম অধিবেশনের সময়।

প্রাথমিকভাবে জনমঞ্চ হিসাবে গণপরিষদ উদ্দেশ্যসংক্রান্ত একটি প্রস্তাব (Objective Resolution) পেশ করে ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৪৬। প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয় ২২ ডিসেম্বর ১৯৪৬। ১৯৪৭ সালের ২২ জানুয়ারি ঘোষিত এ প্রস্তাবে বলা হয় ভারতবর্ষ একটি স্বাধীন, সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র হিসাবে গড়ে উঠবে। এর পরিচালানার জন্য একটি সংবিধান থাকবে। ভারতীয় ইউনিয়ন গড়ে উঠবে দেশীয় রাজ্য, ব্রিটিশ শাসিদ প্রদেশ এবং অন্যান্য অঞ্চল নিয়ে যারা এই স্বাধনী সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রের অংশ হতে চায়। ভারত রাষ্ট্রের জনগণই হবে সব ক্ষমতার উৎস। এখানে সকলের সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত হবে। সকলের জন্য ন্যায়, মর্যাদা, সুযোগ ও আইনের দৃষ্টিতে সমতা থাকবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সকলের স্বাধীনতা থাকবে। সংখ্যালঘুর স্বার্থ সংরক্ষিত হবে। ভারতভূমির সম্মান অর্জনে এবং শান্তি ও মানবতার কল্যাণে দেশ সচেষ্ট হবে।

বর্তমান ভারতীয় সংবিধানের সঙ্গে যেমন একটি প্রস্তাবনা (creamble) সংযুক্ত আছে, গণপরিষদের গৃহীত উদ্দেশ্য সংক্রান্ত প্রসাতবটি সেইরূপ প্রস্তাবনার কাজ করেছে। নেহরু এই প্রস্তাবকে নিছক প্রস্তাব নয়, একটি ঘোষণা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, সংকল্প, অঙ্গীকার, বলে বিবেচনা করেছেন। উদ্দেশ্য সংক্রান্ত প্রস্তাব গণপরিষদের সদস্যদের আদর্শ ভাবনা ও দর্শন প্রচার করেছে ভবিষ্যৎ গণতান্ত্রিক ভারতরাষ্ট্রের লক্ষ্য, কর্মসূচী উদ্দেশ্যসংক্রান্ত প্রস্তাবে প্রতিফলিত হয়েছে। জনমঞ্চ হিসাবে গণপরিষদের কাজকর্মে ভারতীয় নেতৃবর্গের বিচিত্র ভাবনা সমন্বিত হয়েছে। এই ভাবনায় একদিকে যেমন অছে নেহেরুর গণতান্ত্রিক সমাজবাদের ভাবনা ও রাজেন্দ্রপ্রসাদের উদারবাদী ভাবনা, অন্যদিকে আছে প্যাটেলের রক্ষণশীল চিন্তা ও আম্বেদকরের নিপীড়িতের দর্শন। নেহরুর মানবিক প্রত্যয়ের সঙ্গে মিলেছে আজাদের অনুধাবন ও বিবেচনাবোধ। আইনি ও বাস্তবধর্মী চিন্তার সঙ্গে মধ্যপন্থার আদর্শ ও স্থান পেয়েছে গণপরিষদে।

১.৮.২ আইনসভা হিসাবে গণপরিষদ

ভারত বিভাজনের পর গণপরিষদ একটি আইনসভার মতোই ভূমিক পালন করতে থাকে। ডোমিনিয়ন ভারতের সংসদীয় শাসনে গণপরিষদ পরিচিত হল সার্বভৌম সভা হিসাবেঙ্গ নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা হলেন গভর্নর জেনারেল, ভারত সচিবের পদ বিলুপ্ত হল। কেন্দ্রীয় আইনসভার বিলোপ ঘটল। সাময়িকবাবে গণপরিষদই হল আইনসভা। সংবিধান রচনার কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত গণপরিষদ আইনসভার ভূমিকা পালন করবে। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন মেনেই এই সভা চলবে বলে ঠিক হল। দায়িত্বশীল মন্ত্রীসভার (নেহরু মন্ত্রীসভা) পরামর্শ নিয়ে চলবেন গভর্নর জেনারেল (অনেকটা স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতির মতো)। আইনসভা হিসাবে গণপরিষদের কাছে মন্ত্রীসভা দায়িত্বশীল। কেন্দ্রীয় বিষয়গুলির ওপর আইনক্রণয়নের

পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হল গণপরিষদকে। আইনসভা হিসাবে গণপরিষদকে চালনা করার দায়িত্ব পেলেন জি. ডি. মাভলঙ্কার (G. V. Mavlankar)। তিনি হলেন কেন্দ্রীয় আইনসভা হিসাবে গণপরিষদের প্রথম অধ্যক্ষ (Speaker)। আইনসবা হিসাবে গণপরিষদের দায়িত্ব পালনের জন্য গঠিত হল গণপরিষদের বিশেষ কমিটি (Committee of Functions of the Constituent Assembly)। ৭ সদস্যর এই কমিটির সভাপতি হলেন অথ্যক্ষ মাভলাঙ্কান। সাধারণ আইনবিষয়ক কার্য পরিচালনার জন্য অধ্যক্ষের সভাপতিত্বে গণপরিষদর সদস্যরা মিলিত হতে। এক্ষেত্রে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের শর্ত মেনেই চলত অঅইনসভা হিসাবে গণপরিষদের কাজ। ১৯৩৫ সালের বারতশাসন আইনজের বিধি ৯৯ (Section 99) অনুসারে যুক্তরাষ্টরীয় আইনসভা হিসাবে সভা সমস্ত ভারতে আইন প্রণয়নের দায়িত্বে থাকবে এবং প্রথম তালিকার (List I) অন্তর্ভুক্ত বিষয় সমবন্ধে আইন প্রণয়ন করবে। আইনসভা হিসাবে গণপরিষদ প্রাথমিকভাবে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনামত পরিষদে প্রদেশগুলির অন্তভুলক্তি ও প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে রাজ্য কমিটির মাধ্যমে আলোচনা করেছে। বিভিন্ন উপদেষ্টা কমিটি, কার্যনিবাহী কমিটি, কার্যনির্দেশক কমিটিগুলি গণপরিষদে সক্রিয় ছিল।সাংবিধানিক প্রশ্ন থেকে প্রথম পর্যায়ে গণপরিষদে রাজনৈতিক প্রশ্ন বা দেশের ঐক্য নিয়েই বিতর্ক হয়েছে বেশি।

১.৮.৩ গণপরিষদে সংবিধান রচনার কাজ

বিতর্ক সভা, আইনি কার্যাবলীর মধ্যে গণপরিষদের কাজ সীমিত ছিল না। গণপরিষদের মূল ভূমিকা ছিল সংবিধান সভা হিসাবে সংবিধান রচনা করা। গণপরিষদ যখন সংবিধান সভা হিসাবে তার ভূমিকা পালন করেছে, তখন এর কার্য পরিচালনার নেতৃত্বে ছিলেন সভাপতি। স্বাধীনতার পূর্বে গণপরিষদের যে চারটি অধিবেশন বসেছে তারঅধিকাংশ সময় ব্যয় হয়েছে কমিটি গঠনে। কমিটিগুলির কাজকর্মও তেমনবাবে শুরু হতে পারেনি। তৃতীয় অধিবেশনের পূর্বে সাংবিধানিক উপদেষ্টা বি. এন: রাও ভবিষ্যৎ সংবিদানের বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটি প্রশ্নমালা তৈরি করে গণপরিষদের সদস্যদের মধ্যে এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনসভার সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। শাসনবিভাগ, আইনবিভাগ, বিচার বিভাগ, সংবিধান সংগঠন নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল এই প্রশ্নমালায়। গণপরিষদের তৃতীয় অধিবেশনে (২৮ এপ্রিল, ১৯৪৭-এ শুরু এই অধিবেশন ৫ দিন চলেছিল) মৌলিক অধিকারের ওপর উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশ নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় ক্ষমতা কমিটিও এই অধিবেশনে তার সুপারিশ পেশ করে। এই অধিবেশনে গণপরিষদ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সংবিদান কমিটি গঠনক রা ও পরবর্তী অধিবেশনের আগে এই কমিটির সুপারিশ পেশ করার ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি দ্বারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া অনুমোদ করে। তবে এ ব্যাপারে গণপরিষদের কাজ তেমন এগোয়নি।

গণপরিষদের পঞ্চম তথা ১৪ আগস্টের (১৯৪৭) অধিবেশনটিই ছিল ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। মধ্যরাত্রে শুরু এই অধিবেশনেই গণপরিষদের সদস্যরা দেশের সেবায় নিজেদের নিযুক্ত করার শপথ নিলেন। হেরু স্বাধী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন। ইতিপূর্বে গণপরিষদ সার্বভৌম সভা হিসাবে ক্ষমতা পেয়েছে। ২৯ আগস্ট সংবিধান খসড়া কমিটি গঠিত হল। আম্বেদকারের নেতৃত্বে গঠি এই কমিটি সংবিধারেন খসড়া রচনার দায়িত্ব নিল। কমিটিকে সাংবিধানিক উপদেষ্টাদের রচিত সংবিধানের খসড়াপ্রস্তাব পরীক্ষা করে ও অন্যান্য বিষয় খতিয়ে দেখে সভায় প্রস্তাবটি পেশ করার অনুমতি দেওয়া হল।

পরবর্তীকালের ইতিহাস সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে খসড়া কমিটির তৎপরতা ও গভীর অধ্যবসায়ের ইতিহাস। সংবিধানের পদ্ধতিগত নিয়ম স্থির করার জন্য কিছুটা সময় নেবার পর কমিটি আর তেকে থাকে নি। গণপরিষদের সচিবালয় তেকে খসড়া রচনার কাজ আগস্ট, ১৯৪৭ সালেই সম্পন্ন হলেও সাংবিধানিক উপদেষ্টারা খসড়াটিকে প্রস্তুত করলেন অশেবর মাসে। ২৪৩টি অনুচ্ছেদ ও ১৩টি তফশীল সহ সংবিধান রচিত হল। ২৭ অশেবর খসড়া কমিটি বসলো সংবিধান নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে খসড়া কমিটি সংবিধানের যে নতুন খসড়া উপস্থিত করলো তা আকালে আরো বৃহৎ হল। খসড়া কমিটি রচিত সংবিধানে ৩১৫টি অনুচ্ছেদ ও ৮টি তফশীল ছিল।

এর পর খসড়া সংবিধানটি প্রচার করা হল এবং এবিষয়ে গণপরিষদের সদস্য, বারত সরকারের মন্ত্রী, রাজ্য সরকার ও আইনসভার এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত ও হাইকোর্টের কাছে সংবিদানের খসড়া সম্পর্কে মন্তব্য চাওয়া হল। মার্চ মাসের ২২ থেকে ২৪ সংবিদান খসড়াকমিটিতে এইসব মতামত ও মন্তব্য নিয়ে আলোচনা হল। এরপর বিষয়টি পাঠানো হল কেন্দ্রীয় সংবিদান কমিটি, কেন্দ্রীয় ক্ষমতা কমিটি ও রাজ্য সংবিধান সদস্যদের নিয়ে গঠিত এক বিশেষ কমিটির কাছে বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক ঐকযমতের জন্য। এপ্রিলের ১০ ও ১১ তারিখে বিশেষ কমিটিতে আলোচনা হল। ইতিমধ্যে পরামর্শ ও সংশোধন সহ নানা সুপারিশ মতামত সংগৃহীত হয়েছে। বিশেষ কমিটির সদস্য ও বিশেষজ্ঞের মূল্যবান মতামত সামনে রেখেই ১৯৪৮ সালের ১৮-২০ অশেবর খসড়া কমিটি সংবিধানের একটি রূপরেখা তৈরী করে। ১৯৪৮ সালে প্রস্তুত খসড়া সংবিধানের সঙ্গে খসড়া কমিটির সদস্যদের প্রস্তাবিত সংশোধন সংযোজন করে সংবিধানের রূপরেখাটি গণপরিষদে পেশ করা হল। ১৯৪৮ সালের ৪ নভেম্বর। এর পর শুরু হল পণপরিষদে খসড়া সংবিদানকে আইনি রূপ দেবার উদ্যোগ।

প্রথম স্তরে প্রায় পাঁচদিন সংবিধানের নীতির ওপর গণপরিষদে আলোচনা চলেছে। নভেম্বরের ১৫ তারিখে শুরু হল দ্বিতীয় পাঠের (Second Reading) পর্যায়। ১৯৪৯ সালের ১৭ অশেবর এ পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটেছে। তবে এই পর্যায়ে জানুয়ারি ৮ থেকে মে ১৫, জুন ১৭ তেকে জুলাই ২০, সেপ্টম্বর ১৯ থেকে অশেবর ৫—এই তিনটি বিরতি ছিল। দ্বিতীয় পাঠ পর্যায়ে ধরে ধরে, প্রতিটি ধারা ও উপধারার ক্ষপর আলোচনা চলেছে, বহু সংশোধনী (amendments) এসেছে, প্রতিটি ধারা বিচার-বিবেচনা করেই গ্রহণ করা হয়েছে।

বেশ কিছুদিন মুলতুবি থাকার পর গণপরিষদ আবার বসে। এই পর্যায়ে খসড়া কমিটি খসড়া সংবিধানের ারও কিছু পরিবর্তন এনে নভেম্বর মাসের ৩ তরাখি খসড়াটি রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করে। ১৯৪৯ সালে ১৪ নভেম্বর খসড়া সংবিধানের ওপর তৃতীয় পাঠ (Third Reading) শুরু হয়। ইতিমধ্যে সিন্ধু, উত্তর-পশ্চম সীমান্ত প্রদেশ, পূর্ববঙ্গ (সিলেট সহ) এবং বালুচিস্তানের প্রতিনিধিরা ভারতীয় গণপরিষদ ত্যাগ করে পাকিস্তারেন গণপরিষদে যোগ দেন। ভারতীয় গণপষিদে অবশ্য হাদ্রাবাদের সদস্যরা ছাড়া অন্য রাজ্যের (রাজন্য শাসিত) প্রতিনিধিরা যোগ দেন। এই রাজ্যগুলির মধ্যে আনস বন্টনের কজও ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। তৃতীয় পাঠ পর্যায়ে খসড়া সংবিধানের ওপর আরও কিছু সংশোধনী আনা হয়। ১৪-১৬ নভেম্বর এই সংশোধনীগুলি গ্রহণ

করা নিয়ে ভোটাভুটি হয়। ১৭ নভেম্বর খসড়া কমিটির সভাপতি খসড়া সংবিধান গণপরিষদে গ্রহণ করার জন্য বলেন। ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত ওই প্রস্তাবের ওপর আলোচনার পর সংবিধান গ্রহণের জন্য ভোট হয়। এর পর গণপরিষদে উচ্চ কণ্ঠে সাধুবাদ ও জয়ধ্বনির মধ্যে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনে সংবিধান গৃহীত হয়।

২৬ নভেম্বর থেকেই সংবিধান কার্যকর হয়েছে। সম্পূর্ণ সংবিধানটি অবশ্য কার্যকর হয়েছে ২৬ জরুয়ারি ১৯৫০ থেকে। তিন বছরের দীর্ঘ সময়কাল ধরে কাজ করে, ১১টি অধিবেশনে ১৬৫ দিন খরচ করে এবং ওর মধ্যে ১১৪ দিন খসড়া সংবিধানের ওপর আলোচনা কর, প্রায় ৭,৬৩৫টি সংশোধনী সহ (তার মধ্যে ২,৪৭৩টি শেস পর্যন্ত উত্থাপিত হয়) ৩৯৫টি ধারা ও ৮টি তপসিল যুক্ত করে পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধান রচিত হল। সংবিধান রচনার জন্য ব্যয় হয়েছে ৬৪ লক্ষ টাকার বেশী। খসড়া সংবিদান কমিটির সদস্যদের বিপুল উৎসাহ ও পরিশ্রম, সতর্কতা এবং বিচার-বিবেচনাকে মূলধন করে, সভাপতি আম্বেদকরের আইনী ব্যাখ্যা ও যুক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করেই পেশ হল ভারতীয় সংবিধান। সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও গবেষকরা আম্বেদকরকেই সম্মান জানালেন ভারতীয় সংবিধানের জনক (Father of the Indian Constitution) আখ্যা দিয়ে।

সংবিধানের প্রস্তাবনায় (Preamble) প্রকাশিত হল সংবিধানের মূল বাণী। ভারতীয় জনগণের নামেই সংবিধান প্রচারিত হল। প্রতিজ্ঞা করা হল সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান প্রতিষ্ঠার। বহু পরে সংশোধনী এনে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র কথা দুটি যোগ করা হয়েচে। প্রস্তাবনায় এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রী ও ন্যায়বিচারের নীতি।

মূল সংবিধানে নাগরিকতা, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, মৌলিক অধিকার, নির্দেশমূলক নীতি, আইনসভা, শাসনবিভাগ, বিচারবিভাগ, নির্বাচন, রাষ্ট্রগঠন ও প্রদেশের অন্তর্ভুক্তি, সরকারি ভাষা, সংখ্যালঘুর অধিকার এবং আরও নানা বিষয় সংযোজিত হয়েছে। স্বাধীন দেশের সাবধীন সংবিদান রচনার মধ্য দিয়েই পূর্ণ স্বরাজের প্রত্যাশা শেষ পর্যন্ত পরিপূরণ হল।

সব শেষে গণপরিষদের সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনার অবকাশ থেকেই যায়।

১.৯ গণপরিষদের ভূমিকার মূল্যায়ন

গণপরিষদের ভূমিকার মূল্যায়ন করতে গিয়ে অনেকেই অনেক প্রশ্ন তুলেছেন। (১) গণপরিষদ প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক সংস্থা ছিল না। পরোক্ষ নির্বাচন এর ভিত্তি। গণভোটের মাধ্যমে এই সংস্থার উদ্ভব ঘটেনি বা এর পেছনে জনসাধারণের কোন অনুমোদন ছিল না। (২) গণপরিষদ রচিত সংবিধানের কোন মতাদর্শগত স্পষ্টতা বা স্বচ্ছতা ছিল না। (৩) গণপরিষদের রচিত সংবিধানের মৌলিকতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাংবিধানিক নীতির সামঞ্জস্য ঘটিয়ে এমন এক বিশাল সংবিধান সৃষ্টির পেছনে কোন মোনসিকতা কাজ করেছে—এ প্রশ্ন পরায় সব গবেষকই করে থাকেন। ব্রিটিশ স্বার্থ সংরক্ষণ, রাজন্য স্বার্থ সংরক্ষণ করে জনস্বার্থ সংরক্ষণ সম্ভব নয়। ভারতশাসন আইনের (১৯৩৫) বাইরে অতিরিক্ত কিছুই সংবিধানে নেই। (৪)

আইনজ্ঞ রচিত ভারতের সংবিধান আইনী জাল ও জটিলতা অতিক্রম করতে পারে নি। খসড়া সংবিধান কমিটির সদস্যরা এতটাই নমনীয়তা দেখিয়েছেন যে মাঝে মাঝে মনে হয়েছে কোন লক্ষ্যে ওই সংবিধান গঠিত? নমনীয়তার ধারায় পরিচালিত সংবিধান খসড়া কমিটি (Drafting Committee) শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে লক্ষ্যহীন এক কমিটি (Drifting Committee)। (৫) অনেক ক্ষেত্রে াম্বেদকরের নেতৃত্বে খসড়া কমিটিকে মনে হয়েছে আইনের এক শ্রেণীকক্ষ যেকনে ড. আম্বেদকর হলেন গুরুগম্ভীর শিক্ষক যিনি আশা করেন সবাই তাঁর অনুগত ও মনোযাগী ছাত্র। সংবিধানের বিশালত্ব, আইনী মারপ্যাঁচ, পদ্ধতিগত দুর্বলতা নিয়ে কোন প্রশ্নই এই শিক্ষকের পছন্দ নয়। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, সৃষ্টিকর্তা গণপরিষদের উপর খসড়া কমিটির প্রভাব যেন অনেকটা সৃষ্ট জীবের সৃষ্টিকর্তার ওপর প্রভুত্বের মন্ত্রে। গণপরিষদের গতিময় শক্তি হিসাবে নেহেরু, প্রসাদ বা প্যাটেলকে ভাবা হলেও, প্রবাব বা আধিপত্যের ক্ষেত্রে আম্বেদকর, কে. মে. মুন্সী, আয়েঙ্গার, আইয়ার ইত্যাদিরাই যেন গুরুত্ব পেয়েছেন বেশি। নেহরুর আবেগের চেয়ে আম্বেদকরের আইনী ব্যাখ্যা বা মতামতই গুরুত্ব পেয়েছে বেশি।

তবে শুধুমাত্র সীমাবদ্ধতা বা দুর্বলতা চিহ্নিত করে বা গণপরিষদের কাজকর্মে ধারণাগত ফাঁক বা বিচ্যুতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেই সমালোচকেরা তাঁদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না। গণপরিষদ রচিত সংবিধানে প্রত্যাশিত জনপ্রতিনিধিত্ব ছিল না বা ঔপনিবেশিক প্রাপ্তির (colonial legacy) অধিক বা অতিরিক্ত কিছু সংবিধানে পাওয়া যায় নি একথা মেনে নিয়েও বলা যায় সংবিধান রচনার এমন বিরাট ব্যাপক এবং দুঃসাহসিক উদ্যোগ ইতিপূর্বে লক্ষ্য করা যায়নি। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও গণপরিষদ তথা খসড়া কমিটি বিশ্বের এক বৃহত্তম সংবিধান আমাদের উপহার দিয়েছে। গণপরিষদের কার্যবিবরীণীর দিকে গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে একটি অতি বৃহৎ দেশের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনার জন্য কতটা গণতন্ত্রসম্মত অনুশীলন ও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়েছে। যে সহিষ্ণু মনোবাব দিয়ে পরিষদের কার্যক্রম চলেছে, প্রতিটি প্রশ্নে বিতর্ক বা আলোচনার যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে, যে ধৈর্য নিয়ে প্রতিটি সমালোচনাকে গ্রহণ করা হয়েছে—পৃথিবীর খুব কম দেশেই সংবিদান রচনার এমন প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে। দ্রুততা ও হঠকারিতার পথে সংবিধান জনগরে ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এমন অভিযোগ গণপরিষদের কূট-সমালোচকও করবেন না। নেহরুর দূরদর্শিতা, আম্বেদকরের বিশেষজ্ঞ জ্ঞান বা আইনজ্ঞগণের সংগঠিত আইনি ধারণা যে কোন দেশের সংবিধান রচয়িতার কাছে এক অনুকরণযোগ্য দৃষ্টান্ত হতে পারে। গ্র্যানভিল অস্টিন (Granville Austin) বলেছেন, গণপরিষদের লক্ষ্য চিল সমাজ বিপ্লবের এক লক্ষ্যকে পূর্ণ করা। জোহারি বলেছেন, গণপরিষদ যে সংবিধান রচনা করেছে, তা জনসম্মতির ভিত্তিতে বিপ্লবের জয়কে সূচিত করেছে। গণপরিষদ রচিত সংবিদান জনগণের প্রতি কর্তব্যের এক অঙ্গীকার, জনকল্যাণের লক্ষ্যে এক সমাজ বিন্যাসকে রূপ দেবার ও সুরক্ষিত করার এক অসাধারণ নির্দেশিকা। সংবিদানের প্রস্তাবনায় সংবিধান যে জনগণের জন্যই নিবেদিত সেই বাণীই উচ্চারিত।

একথা সত্য কোন সংবিদানই চরম পূর্ণতা বা শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে না। গণপরিষদের রচিত ভারতের সংবিধানও এক্ষেত্রে ব্যতিক্র নয়। এম. ভি. পাইলি (M. V. Pylee) যথার্থই বলেছেন এটি একটি কার্যসাধনার দলিল (A workable document), আদর্শ ও বাস্তবতার সমন্বয় ঘটেছে এর মধ্যে (It is a

blend of idealism and realism)। এরকম একটি সংবিধানকে রূপ দিতে গণতন্ত্রসম্মত ভাবে যা করা প্রয়োজন, যে গভীর বিশ্লেষণ, যুক্তি-তর্ক, অনুসন্ধানী উদ্যোগের প্রতিফলন ঘটানো দরকার, সেটাই ঘটেছে। ভারতের সংবিধান সনাতন বা প্রচলতি দেশীয় ভাবধারাকে যেমন গরহণ করেছে, তেমনি পরিবর্তনশীল বা গতিশীল সমাজের চাহিদা বা প্রয়োজনকেও সমানভাবে মূল্য দিয়েছে। উপসংহারে বলা যায় স্বাধীন ভারতের জন্য যে সংবিধান পাওয়া গেল তা একান্তভাবে তাৎপর্যপূর্ণ প্রথানত তিনটি কারণে ঃ (১) সার্বিক ঐক্যমদের (consensus) সুরে বাঁধার প্রচেষ্টা ও প্রক্রিয়া ছিল সংবিধান রচনার উদ্যোগটি। সংবিধানকে ভারতীয় ঐক্যের একটি ঘোষণা (a charter of Indian unity) বললে অত্যুক্তি হয় না। (২) গণতন্ত্র ও মানবিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার এক দৃঢ় প্রত্যয় উচ্চারিত হয়েছে ভারতীয় সংবিধানে। গণতান্ত্রিক ও মানবিক সংবিধানের পরিচয় পত্র (Indentity Card) হিসাবেই উত্থাপিত হচ্ছে সংবিধানের প্রস্তাবনা। (৩) সংবিধানের মর্যাদা এবং সামাজিক ও নৈতিক মূল্য নির্ধারিত হয় অবশ্যই এর প্রজাতন্ত্রী ও ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রে। ব্রিটিশ ভারতের সাংবিধানিক সংস্কার ও প্রস্তাবগুলি থেকে গণপরিষদ রচিত সংবিধান চরিত্রে ও লক্ষ্যে অবশ্যই স্বতন্ত্র। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এবং সরকারের তদারকি ও নির্দেশের অবসান হল। অস্থায়ী আইনসভা হিসাবে দায়িত্ব নিল গণপরিষদ। স্বাধীন ভারতের স্বাধী সরকারের দায়িত্বে জনগণের নামে নতুন সংবিধান নিয়ে এক স্বাধীন জাতির শুভযাত্রার সূচনা হল।

১.১০ সারাংশ

দেশ শাসন ও পরিচালনার এক উৎকৃষ্ট বিধিব্যবস্থা হল সংবিধান। বর্তমান এককের আলোচনা থেকে আপনারা জানলেন সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যেই স্বাধীনতার আগেই সৃষ্টি হয়েছে গণপরিষদ। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন মঞ্চে, গান্ধীজি, নেহরু ও অন্যান্য জাতীয় নেতৃবর্গের দাবিতে গণপরিষদ সৃষ্টির যে বীজ বপন করা হয়েছিল সেটাই অঙ্কুরিত হল ব্রিটিশ সরকার প্রস্তাবিত বিভিন্ন সংস্কারের মাধ্যমে। জাতীয় কংগ্রেসের স্বরাজ ভাবনা, হোমরুল আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিতে গান্ধীজির স্বরাজ ও বাধীনতার দাবি, সর্বদলীয় বৈঠকে সংবিধান কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত, মতিলাল নেহরু কমিটির ডোমিনিয়ন মর্যাদা দাবি, জাতীয় কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজের দাবি, আগস্ট আন্দোলন, সুভাষের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযান, ৪৫-৪৬ এর বৈপ্লবিক গণবিক্ষোভ, নৌ-বিদ্রোহ, মুসলিম লিগের লাহোর প্রস্তাব (পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবি) সবকিছুর মধ্যেই ছিল গণপরিষদ সৃষ্টির বাস্তব উপাদান।

জাতীয় আন্দোলনের এই প্রবল পরিস্থিতি ও চাপের মুখে পড়েই ব্রিটিশ সরকার সাংবিধানিক সংস্কারের কিছু প্রস্তাব নেয়। ১৯০৯, ১৯১৯ সালের সংস্কার আইনে সাংবিধানিক গণতন্ত্রের যে আভাস চিল, সাইমন কমিশন, বিভিন্ন গোলটেবিল বৈঠকে প্রস্তাবিত শাসন সংস্কার, সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা, সাংবিধানিক সংস্কার বিষয়ে শ্বেতপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে তাকে প্রসারিত করার প্রত্যাশা ব্রিটিশ সরকারের তরফে ভারতবাসীর কাছে পেশ হয়েছে মাত্র। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনেও স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব ছিল না; তবে এই আইন দায়িত্বশীল সাংবিধানিক শাসন ও সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে ভারতবাসীর মনে আশা জাগিয়েছে। ব্রিটিশ

সরকারের তরফে গণপরিষদ গঠনের ক্ষেত্রেও ভারতবাসীকে শাসনাধিকার দেবার প্রশ্নে ক্রিপ্‌স্‌ প্রস্তাব (১৯৪০) , ওয়াভেন পরিকল্পনা (১৯৪৫), ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা (১৯৪৬) অবশ্যই গঠনমূলক প্রস্তাব। ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় গণপরিষদ সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট প্রস্তাব ছির্ল। এই প্রস্তাব মেনেই ভারতে গণপরিষদের নির্বাচন হয়েছে এবং গণপরিষদ গঠিত হয়েছে। মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনায় (১৯৪৭) গণপরিষদ গঠনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবিভাজন ও ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনাও কার্যকর হল এবং এই পরিকলকল্পনা মতই গণপরিষদেরও বিভাজন ঘটলো। ভারতের স্বাধীনতা আইনে (জুন, ১৯৪৭) ভারতবিভাজন, ক্ষমতা হস্তান্তর ও গণপরিষদের ধারণা আইনি রূপ পেল।

গণপরিষদ সম্পর্কে মুসলিম লিগের অবস্থান তেমন স্পষ্ট ছিল না। কংগ্রেস আধিপত্য মেনে গণপষিদে অংশ নেবার ইচ্ছা না থাকাতে শেষ পর্যন্ত মুসলিম লিগের নেতৃত্বে স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রে তাদের নিজস্ব গণপরিএষদ গঠিত হয়। গণপরিষদে অংশ নেবার ব্যাপারে দেশীয় রাজন্যবর্গের ওপর কোন চাপ না থাকলেও রাজন্যবর্গ তাদের পছন্দমত গণপরিষদকেই বেছে নিয়েছেন।

১৯৪৬ সালের ৯ ডিসেম্বর অবিভক্ত ভারতের গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ গণপরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। গণপরিষদের গঠনপদ্ধতির উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এর বিশাল সদস্যসংখা। নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্য নিয়ে অবিভক্ত ভারতে পরিষদের সদস্য ছিল ৩৮৯। দেশবিভাগের পর স্বতন্ত্র ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য দাঁড়াল ২৯৯। পরিষদের অন্যান্য গঠনতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য হল কংগ্রেসের সংখ্যাধিক্য, কমিটির মাধ্যমে সভার কাজ পরিচালানা এবং পরিষদীয় পদ্ধতি মেনে বৈঠক ও বিতর্ক পরিচালনা। আইনসভা হিসাবে পরিষদের কার্যপরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন জি. ভি. মভলঙ্কর। গুরুত্বপূর্ণ কমিটিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে কেন্দ্রী ক্ষমতা সংক্রান্ত কমিটি, সর্দার প্যাটেলের নেতৃত্বে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত কমিটি, সংখ্যালঘু বিষয়ক কমিটি, ড. কে. মে. মুন্সীর নেতৃত্বে কার্যনির্বাহ কমিটি, সর্দার প্যাটেলের নেতৃত্বে প্রাদেশিক সংবিধান কমিটি, নেহরুর নেতঁত্বে কেন্দ্রী সংবিদান কমিটি, রাজেন্দ্রপ্রসাদের নেতৃত্বে কার্যবিধি সংক্রান্ত কমিটি ও পরিচালনা কমিটি এবং ড. বি. আর. আম্বেদকরের নেতৃত্বে সংবিধান খসড়া কমিটি, বিভিন্ন অধিবেশনে (অবিভক্ত ভারতে চারটি অধিবেশন) মিলিত হয়ে গণপরিষদের কাজকর্ম চলত। গণপরিষদের অধিবেশনের মধ্যে ঐতিহাসকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল পঞ্চম অধিবেশন (২৪ আগস্ট, ১৯৪৭ মধ্য রাত্রে এই অধিবেশন বসে) এবং এই অধিবেশনেই স্বীন ভারতের জনগণের নামে ও গংগ্রেস দলের নেতৃত্বে গণপরিষদরে পুনর্বিন্যাস হয় ও সংবিধান রচনার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই অধিবেশনেই সংবিধান খসড়া কমিটি গঠন করে এই কমিটির হাতে সবিধান রচনার দায়িত্ব দেওয়া হল। গণপরিষদের একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে নানা বৃত্তি ও পেশার ও সম্প্রদায়ের মানুষ ওই সভার প্রতিনিধি হিসাবে হাজির ছিলেন।

গণপরিষদের কাজকর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বিতর্কসভা হিসাবে নানা প্রশ্ন নিয়েও সমস্যা নিয়ে সদস্যরা আলোচনা করেন। উদ্দেশ্য ও আদর্শ সংক্রান্ত প্রস্তাবের মধ্যেই চিল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্মসূচী। ভারতীয় স্বাধীনতা আইন অনুসারে গণপরিষদ সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করে এবং অস্থায়ী আইনসভা হিসাবে তার দায়িত্ব পালনৈ করে। তবে সংবিদান রচনাই ছিল গণপরিষদের মূল দায়িত্ব। নানা যত্ন ও অনুশীলনের

মধ্য দিয়ে, ব্যাখ্যা ও বিতর্কের নানা স্তর পেরিয়ে গণতন্ত্রসম্মত ভাবে দীর্ঘ সময় নিয়ে সংবিধান রচনার কাজ কলে। প্রস্তাব, অভিষিক্ত প্রসাত সংশোধন, সংযোজন করেই আইন বিশেষজ্ঞরা ভারতের সংবিধানকে রূপ দিয়েছেন। একটি গণতান্ত্রিক সংবিধানের সকল বৈশিষ্ট্যই ভারতের সংবিধানে ছিল।

১.১১ অনুশীলনী

১। রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

(ক) গণপরিষদ সৃষ্টির ইতিহাস সংক্ষেপে লিখুন।

(খ) জাতীয় কংগ্রেসের বিভিন্ন মঞ্চে গণপরিষদ স্পর্কে যে দাবি উঠেচিল সে বিষয়ে আলোচনা করুন।

(গ) গণপরিষদের কার্যাবলী সম্পর্কে লিখুন।

(ঘ) সংক্ষেপে গণপরিষদ সম্পর্কে একটি টীকা রচনা করুন।

(ঙ) সংবিধান রচনার কাজে গণপরিষদের ভূমিকা আলোচনা করুন।

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) গণপরিষদ সৃষ্টির পেছনে ভারতীয় ভাবনা কী ছিল?

(খ) গণপরিষদ সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের মনোবাব ও নীতি ব্যাখ্যা করুন।

(গ) ওয়াভেল পরিকল্পনা ও ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় গণপরিষদ সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

(ঘ) গণপরিষদের প্রশ্নে মুসলিম লিগের মনোভাব কী ছিল?

(ঙ) গণরিষদের গঠনতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন।

৩। টীকা লিখুন ঃ

(ক) গণপরিষদের বিভিন্ন কমিটি।

(খ) সংবিধান খসড়া কমিটি।

(গ) গণপরিষদ ও দেশীয় রাজ্য।

(ঘ) আইনসভা হিসাবে গণপরিষদের কাজকর্ম।

(ঙ) গণপরিষদের নেতৃত্ব।

১.১২ গ্রন্থপঞ্জী

১। Durga Das Basu, *Introduction to the Constitution of India* (1999).

২। Granville Austin, *The Indian Constitution Cornerstone of a Nation* (1985).

৩। J. C. Johri, *Indina Government and Politics*, Vol. I, 1996.

৪। D. N Sen, *From Raj to Swaraj* (1954).

৫। M. M. Singh, *From Raj to Republic : A Retrospect* (1972)

৬। R. C. Agarwal, *Indian Political System* (2002)

৭। M. V. Pylee, *India's Constitution* (2002)

৮। Bipin Chandra, Mridula Mukherjee and Aditya Mukherjee, *India After Independence* (1999).